ছেলেবেলার উৎসবের স্মৃতি

কফিহাউসের আড্ডা

ছেলেবেলার উৎসবের স্মৃতি

কফিহাউসের আড্ডা স্মৃতিকথা সঙ্কলন

বৈশাখ ১৪১৮

গ্রন্থস্বত্ব

কফিহাউসের আড্ডা

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৪১৮ | মে ২০১১

দ্বিতীয় অন্তর্জাল সংস্করণ

বৈশাখ ১৪১৮ | মে ২০১১

প্রকাশনা

কফিহাউসের আড্ডা
কলকাতা - ৭০০০৭৮
coffeehouseraddablog@gmail.com

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র

সৃজন

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

মেঘ

উৎসর্গ

সকল ব্লগার বন্ধুকে

গোড়ার কথা

কফিহাউসের আড্ডা ব্লগের তরফ থেকে এটি প্রথম ই-বুক প্রকাশনা। অনেক দিন থেকেই চলে আসছে একটি ই-বুক প্রকাশনার পরিকল্পনা। কিছু পরিকল্পনা নিলেও বিভিন্ন কারণে তা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই অনিচ্ছাকৃত ভাবেও কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে ইচ্ছে করছে। পশ্চিমবাংলার বাঙালীদের ব্লগিং প্লাটফর্মে উৎসাহিত করতে কফিহাউসের আড্ডা নামের এই বাংলা ব্লগটি শুরু হয় প্রায় দু-বছর আগে, ২০০৯ সালে। তবে যতটা আশা করা হয়েছিল, ততটা কেন, এই দু বছরে সাড়া মেলেনি তার সিকিভাগও। অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সঙ্গে থাকেননি। হঠাৎ করেই বিদায় নিয়েছেন। ফলে এই সময়ের অনেকটাই কেটেছে গভীর শূন্যতার আসরে। ইন্টারনেটে বাংলা ভাষা চর্চার অবিশ্বাস্য প্রসার পশ্চিমবাংলায় কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এমনকি সাহিত্য অনুরাগী বা ইন্টারনেটে স্বচ্ছন্দ অনেকেই শুধু না জানার অজুহাতে মুখ ফিরিয়ে রইলেন ব্লগিং দুনিয়া থেকে। কিন্তু যা হয়নি তা হয়নি। এই বিষয়ে হার স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। সম্প্রতি আমরা কফিহাউসের আড্ডা ব্লগটিকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তবে সেই নিস্তরঙ্গ ব্লগাড্ডায় তুফান সেভাবে ওঠেনি। আমরা হীন দীন কয়েকজন উৎসাহী টিমটিম করে ব্লগটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি মাত্র। কৈশোরের সোপান উত্তীর্ণ হতে এখনও আমাদের অনেক সময় লাগবে।

ছেলেবেলায় উৎসবের স্মৃতি নিয়ে একটি ই-বুক প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয় ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দুর্গাপূজা ও ঈদ এই দুই শারদ উৎসবকে ঘিরে বাঙালির উদ্দীপনার শেষ নেই। আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি কয়েকটি আলো ঝলমল দিনের জন্য। আর এই সময়টায় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতিরও একটা জোয়ার আসে। আমাদের ইচ্ছে ছিল চলতি বছরের উৎসবের মধ্যেই ই-বুকটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কেন পারিনি সেইসব বাজে অজুহাতের মধ্যে না গিয়ে বরং বলব দেরী করে এসেছি। বৈশাখ মাসের এই পোড়া গরমে যখন সাধারণ জীবনযাত্রার হাল বেহাল, শরীর অবসন্ন, মন বিপর্যস্ত তখন কি দিনের কোনও একটা কর্মহীন অধ্যায় উৎসবের স্মৃতি-মেদুর হয়ে উঠবে? স্বাভাবিকভাবে নয়। তবু স্বাদ-বদলের জন্য বিভিন্ন স্মৃতির এই সম্ভার আমরা এনেছি, তা যে কিছুটা হলেও আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

কফিহাউসের আড্ডাকে ভালোবেসে এই সুন্দর ই-বুকটি সাজিয়ে দিয়েছেন মেঘ। আর সেই-সঙ্গে ছবি দিয়েছেন সৃজন, মহাশ্বেতা, ইন্দিরা ও পাগলাবাবু - এঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রথম প্রয়াস হিসেবে কিছু ভুলত্রুটি হলে মার্জনা করবেন। আশা রাখছি শিশু যেমন হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শেখে, বাঙালিও একদিন ইন্টারনেটে ভাষা চর্চায় এগিয়ে আসবে। সেদিনটা তাড়াতাড়ি আসুক এই প্রার্থনা করব। ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন।

অভ্র

সূচীপত্র

অপলক

স্মৃতির সারণি বেয়ে

অন্য পুজো

আমার পুজোর ছুটি

শিউলিফুলের গন্ধ

দুর্গাপূজা এসে গেলো

পূজোর স্মৃতি

দুগগাপূজোর দিনগুলো

সে দিনের ঈদ গুলি

অভ্র

ইন্দিরা মুখার্জি

অধরামাধুরী

নিতা

মহাশ্বেতা

অতনু ব্যানার্জী

স্বপ্ননীল

অভ্র

নীল নক্ষত্র

দুগগা পুজা’ ও একটি বাল্যকাল	রাজা সরকার
সেই যে আমার দিনগুলি	মাল্যবান
পুজো	সুশান্ত কর
সেইসব আলোমাখা উৎসব	মেঘ
সেবারের সেই পুজো এবং পনঙ্কু	সুশান্ত কর
দেবীপক্ষে শুরু উল্কা-দান দিয়ে শেষ	মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

অপলক

অভ্র

অনির্বাণ চলপথে কয়েকটি মুহূর্ত থেমে আছে – থাকুক। আমিই একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন এইসব দেখতে বড় ভালো লাগে।
নীল জামা, সাদা হাফপ্যান্ট। লুকোচুরি খেলছে। পাড়ার অলিগলি পেরিয়ে টুপটাপ এখান ওখান থেকে উঁকি মারতে ভালোবাসে। আবার লুকোতেও। একবার হারিয়ে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিলিস রে তুই? আরেকটু দূরে গেলে? একবারে হারিয়ে গেলে? কোথায় খুঁজে পেতাম তোকে? সে একেবারে হারায় না। মাঝে মাঝে আড়াল থেকে উঁকি মারে। বেশ, নয়?
- হারিয়ে যেতে বুঝি তোর বড় ভালো লাগে? এতদূর কোথায় চলিস? অচেনা মানুষের ভিড় চারিদিকে সব। দেখিস আবার হারাস না যেনচুপটি করে বিছানায় ! শুয়ে শুয়ে মহালয়া শোন। কান পেতে শোন।
শুনি। শব্দ শুনে বুঝি আসছে। দুহাত ছুটির মত মেলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ছুটি যে নেই। পায়ে শেকল থাকলেও নেই, না থাকলেও নেই। একছুটে পালাতে পালাতে যে আমার হারিয়ে যাওয়া শরৎ, কাশফুল, আকাশ, নদী সবটুকু খুঁজে আনব সে উপায় নেই। নদীর ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে ঐ কালো-তিল মেয়েটি বুঝি? সবাই একসাথে বেশ আছো হে তোমরা। শুধু যে আমি নিজের কাছ থেকে দুদণ্ড পালাবো সে উপায় নেই।
আমি এক-বুক গভীর জলে, হয়তো একটু পরে তলিয়ে যাব। কোথায়? জানি না। হয়তো তলিয়ে যেতে যেতে পায়ের নীচে এতটুকু জমিন পাবো। অপেক্ষা করব সেখানেই। হয়তো তখনও একটু সময় সবুজের মত জেগে থাকবে, নিকষ কালো অন্ধকারের অবরুদ্ধতায় প্রতিফলিত হতে থাকবে শব্দগুলো। বারবার শুনবো নিজের কণ্ঠস্বর। ঘুমের মধ্যে, বাইরেও। ধোঁয়ায় ভরবে আমার ঘর। এসট্রেও। সদ্য গোঁফ ওঠা তরুণ আমার মার্বেলের এসট্রে ভরিয়ে রেখে যাবে। বলি – দূর হ। কিন্তু সুখটান, বড় সুখের।
সবাইকে দেখেছি জমিয়ে রাখতে ভালোবাসে। ইচ্ছে করে আমারও। একটু একটু করে পাললিক শিলায় লিখি। যতক্ষণ অপলক, ততক্ষণ স্মৃতি। ঐ লোভটুকু ষোল আনা আছে। থাকবেও।
যেমন অনির্বাণ চলপথে কয়েকটি মুহূর্ত থেমে আছে -

স্মৃতির সারণি বেয়ে

ইন্দিরা মুখার্জি

১

ছোটবেলার পুজোর স্মৃতি লিখতে বসে অনেক কিছু মনে পড়ে যায় । আমার সেই ছোট্টবেলা কেটেছে বরানগরের মফ:স্বল অঞ্চল আলমবাজারে । অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম আমার । গান, পড়াশুনো আর ছবি আঁকা ছাড়া ডাইভার্সান বলতে ছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির গঙ্গার ধার, পঞ্চবটি , সারদামঠ| আমার সবচেয়ে বড়বন্ধু ছিল আমার মা আর তারপর আমার চেয়ে ন'বছরের ছোট আমার ভাই । বাবা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিতে সেলসের চাকরী করতেন । সরাবছর বাবাকে ট্যুর করতে হত । তাই বাবা যখন উইকএন্ডে বাড়ি আসতেন তখন আমাদের একটু ব্রেক হত । পুজো এসে গেলেই মাসদুয়েক আগে বাবা কোনো একটা উইক এন্ডে আমাদের নিয়ে কোলকাতায় যেতেন পুজোর বাজার করতে । সেটা ছিল আমাদের সবচাইতে বড় এক্সাইটমেন্ট । সারাদিনের প্রোগ্রাম । সকাল বেলায় ভারী জলখাবার খেয়ে বেরুনো হত আর ফেরা হত ট্যাক্সি করে সেই রাতে । আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা সরকারি স্পেশাল বাস এস্-১৭ তে চেপে বসতাম আমরা চারজনে । তারপর গিয়ে নামা হত লিন্ডসে স্ট্রীট । সেখানে গিয়ে প্রথমেই বাবা আমাদের ক্যাম্পাকোলা খাওয়াতেন । তারপর সোজা হেঁটে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে গিয়ে চীনে বাজারে জুতো কেনা হত । চীনেপাড়ার ওস্তাদদের হাতে বানানো জুতোতে নাকি পা ভালো থাকে তাই এত কষ্ট করা । এরপর সেই চরজোড়া জুতোর বাক্স বয়ে আসা হত নিউমার্কেটে । আমার সুন্দর ফ্রক কেনা হত স্টাইল টেক্স থেকে । মা প্রতিটি ফ্রকের ঝুল আর ডিজাইন খুঁটিয়ে দেখতেন যাতে আমার শালীনতার মাত্রা বজায় থাকে । তবে রঙ পছন্দের ব্যাপারে আমার পছন্দ কেই সম্মান কর হত । চারটে জামা কেনা হত । বাবার দেওয়া, মায়ের দেওয়া মামাবাড়ির দিদিমার টাকায় কেনা আর ঠাম্মার টাকায় কেনা । এরপর জ্যাঠামশাই, পিসি, মাসীরা বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতেন তাঁদের দেয় জামা কাপড় । আমার সাথে ভাইয়েরটা কেনা হত রহমন স্টোর্স থেকে । তারও চারটে চার রকম । এরপর মায়ের শাড়ি । খুব ফ্যাশানেবল মহিলা তিনি বেথুন কলেজের স্নাতক । হোক না উত্তর কোলকাতার কিন্তু হাল ফ্যাশনের শাড়ি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন মহিলা ছিলেন আমার মা । তাই গঙ্গাদীন গুপ্তার অর্গ্যান্ডি আর কোটা শাড়ি, জয়সওয়াল স্টোর্স থেকে মার তাঁতের শাড়ি ঠাম্মার দুধ সাদা ফাইন থান, দিদিমার ইঞ্চিপাড়ের সাদা শাড়ি মাদুর্গার লালাপেড়ে শাড়ি জ্যাঠামশাইদের জন্য ফাইন ধুতি গামছা সব কিনে কেটে আমরা যেতাম নাহুম'স এ । নিউমার্কেটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এই নাহুম'স এর চিজ প্যাটি আর ডি গামার কেক। কেক প্যাটি খেয়ে আর বাড়ির জন্য একবাক্স বগল দাবা করে যাওয়া হত লিন্ডসে স্ট্রীটের হ্যান্ডলুম হাউসে । এখানে তখন তো আর আনাচে কানাচে এত বুটিক ছিলনা তাই এক্সক্লুসিভ পিওর সিল্ক শাড়ি কিনতে মা ওখানে যাবে ই । আর সেখানে এক ঢিলে দুই পাখি ! পর্দার কাপড়, বেডশিট সব কিছুই সুন্দর মিলত

ন্যাজ্যদামে । বাবা নিজের জন্য কিছু কিনতে চাইতেন না । মা জোর করে মহাদেবী এন্ড মেহতা থেকে বাবার জন্য শার্ট-প্যান্টের পিস কিনে দিতেন। এরপর আমরা লাঞ্চ খেতাম ইন্দ্রমহলে । তখন রাস্তার ধারে ধারে এত ভালো খাবারের দোকান ছিলনা কিন্তু এ পাড়ায় এত সুন্দর সঠিক দামের ভাল ভাল ফুড জয়েন্ট ছিল (এখনো আছে অবিশ্যি) যে এ পাড়ায় এলে না খেয়ে ফেরাটা বোকামি হত । আমরা ছোলে-ভাটুরে আর স্পেশাল কুলফি মালাই খেতাম ইন্দ্রমহলে ঢুকে । Rally'sএর সিরাপ আর সিমাইয়ের পায়েস সহযোগে এমন সুন্দর কুলফি মালাই বোধ হয় আর কোথাও তখন পাওয়া যেত না। এরপর আমাদের অভিযান হত সিম্ফনি দোকানটিতে। নতুন পুজোর গানের এল পি রেকর্ড। আর তখন এইচ এমভি থেকে শিল্পীদের গানের রেকর্ড কিনলে একটা গানের লিরিকসের বই দিত ।

মায়ের নজর থাকত তার দিকে । ততক্ষণে ফুটপাথের দোকান থেকে ভাই মায়ের আঁচলে গেরো দিয়ে একটা গাড়ি কি মোটর সাইকেল, একটা ক্যাডবেরি বাগিয়ে বসে আছে; আমার একটা হেয়ারব্যান্ড, জামার সাথে ম্যাচ করে দুটো ক্লিপ আর রিবন ও কেনা হয়ে গেছে। বাবা বলছেন রেগে মেগে আর এ বছরই শেষ বার, তোমাদের নিয়ে আর আসা যাবে না এখানে । এত বায়না তোমাদের !সেটা বাবা যে এমনি এমনি বলতেন সেটা আমি বুঝতাম । বেচারা ভাই আমার ভয় পেয়ে যেত। কারণ বাবা ভীষণ মাটির মানুষ। যত রাগী ততটাই নরম । বাবা ও আমাদের খুব বন্ধু । সত্যি বলতে কি বাড়ির পরিবেশটা আমরা দুই ভাই বোন মিলে এতটাই উপভোগ করেছি যে আমাদের বহির্মুখি হবার কোনো অবকাশ ছিল না । বাবা-মা আমাদের দুজনকে যতটাই শাসন করেছেন ততটাই আদর দিয়েছেন তাই বোধ হয় পড়াশুনোর সাথে সাথে গান, ছবি আঁকা লেখা সব কিছু সুন্দর ভাবে গুছিয়ে জীবনের তরীটাকে এখনো ঠিকমত বেয়ে চলতে পারছি। আমরা দুই ভাই বোনে যেদিন থেকে বুঝেছিলাম যে এই মানুষ দুটি কি পছন্দ করে সেদিন থেকে আমরা আমাদের মত সেই কাজ গুলো করে গেছি । ক্লাস নাইনে উঠতেই আমাদের দু'জনের গান শেখা বন্ধ হয়ে গেছিল শুধু মাধ্যমিক আগত প্রায় বলে । তখন বুঝলাম গান করতে চাইলেও পড়াশোনাটায় এক্সেল হলেই মা বাবা খুশি । তাই যেই একটা একটা করে বড় পরীক্ষা দিয়েছি। অবকাশে শিখেছি গান ; সে এমএসসি পর্যন্ত; এখনকার বাচ্চাদের দেখলে কষ্ট হয় তাদের ওপর কত চাপ! আমরাও ছোট বেলায় পুজোর প্রোগ্রাম করেছি। কিন্তু এত টেনশানের মধ্যে নয় । ঐ যে মা বলেছিলেন আগে পড়াশুনো কর তার পর সব হবে আপ সে । পুজোর বাজার করতে এখনকার টিন এজাররা দেখি বন্ধুবান্ধবদের সাথে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের কখনো মনে হয়নি যে আমরা কেন এই দুটো অভিভাবকের সাথে হাত ধরে যাচ্ছি । বরং কলেজে পড়াকালীন মা হাতে টাকা দিয়েছেন বন্ধুদের সাথে গিয়ে ইচ্ছেমত ড্রেস কেনার জন্য, শাড়ি কেনার জন্য ।

বিকেলে চা খেতে ঢোকা হত অনাদি কেবিনে । আমরা দুই ভাইবোন ছোট থেকে চা খাই। বাবার মতে চা খেলে অনেক ভাইরাস ইনফেকশান এড়ানো যায় আর চা হল নার্ভ ষ্টিম্যুলেন্ট । উঁচুক্লাসে উঠলে রাত জেগে যখন পড়তে হবে তখন চা কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে নাকি অযথা ঘুম পাবে না। তা যাই হোক পুজোর বাজার করতে গিয়ে চাআর অনাদির স্পেশাল মোগলাই পরটা খাওয়া হত। বাবা যেন এই একটা দিন বাইরের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে লাগাম ছেড়ে দিতেন আমাদের । আর তখন কোলকাতা এত পরিচ্ছন্ন ছিল যে বাইরে খেয়ে জন্ডিস বা আন্ত্রিকের মত অসুখ করে যেত না। এখন আমরা বাইরে খেলেই ভাবি ভালো জায়গায় যেতে হবে । এসি থাকতে হবে । ভাজাভুজি খাব না । হেল্থ রুল মেনে খেতে হবে, খোলা জিনিস খাওয়া চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি... এবার বাকি থাকত টুকিটাকি । কাজের লোকেরা তখন যা দেওয়া হত তাই নিত মাথা পেতে । তাদের চাহিদাও এখনকার মত বেশী ছিলনা । এখন যেমন সকলে বলে " যা মাইনে তাই দিও বৌদি " তখন অমন ছিলনা মনিবের যা ইচ্ছে হবে তাই দেবে । হ্যাঁ, তাই বলে পুরোণো লোককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হত না । তাই তাদের জন্য গুছিয়ে জিনিস কেনা হত । সন্ধ্যের ঝুলে একবার মনে পড়ে বাবা

আমাদের চাইনিজ রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন ঐ পাড়ার ফেমাস " কারকো " তে । আমরা এর আগে কখনো চীনে খাবার খাইনি । তখন কোলকাতায় চীনে খাবারের চল সবে হচ্ছে । কথায় কথায় হাত বাড়ালেই "মেন ল্যান্ড চায়না" বা " মার্কো পোলো " ছিলনা । "চাঙোয়া", "জিমিস কিচেন", "পিপিং" আর "কারকো" এই ক'টি চীনে রেস্তোরাঁতেই সাবেকী চীনে খাবার মিলত । আর চাইনিজ খাবারে ইন্ডিয়ানত্বের ছোঁয়াও ছিল অল্প তাই আমাদের বরং অসুবিধেই হত কেবল গোল্ডেন ফ্রায়েড প্রণ ছাড়া আর কোনো পদই পাত্তা পেতে না । এদিকে বাবা অফিসের কনফারেন্সে খেয়ে এসে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন । বলতেন চাইনিজ খাবারের অভ্যেস কর । সহজ পাচ্য, তেল মশলা কম । আর সস ভিত্তিক রান্না তাই মুখ বদলানোর পক্ষে আদর্শ । কিন্তু "ভবি" মানে আমরা বাকী তিন জন সে কথা মানতাম না । শুধুই গোল্ডেন ফ্রায়েড প্রণের দিকে হাত বাড়াতাম । একবার সেই সন্ধ্যে বেলার পুজোর বাজারের পর বাবা "কারকো"য় গিয়ে অর্ডার দিলেন ফ্রায়েড প্রণের সাথে চিকেন নুডলস । আর পার্সেল প্যাক নিয়ে বাড়ি ফেরা হল রাতে খাবার জন্য । কিন্তু বাড়ি এসে আমরা কেবল খেলাম সেই প্রণ গুলো কারণ নুডলস খেয়েই মা , আমি আর ভাই প্রায় গা গুলিয়ে মরি আর কি ! বাবা খেলেন সবরকম, বাকীটা ফেলে দেওয়া হল । বাবা বললেন " কি সব ভূত গুলো । এই সব খাবারের মর্ম বুঝলো না । পরে যখন চাইনিজ খাবারে আসক্ত হলাম তখন বারবার ছুটেছি কারকোয় কিন্তু তখন বাবা আর মা সাথে নেই । হয়ত আমি আর ভাই, কিম্বা বিয়ের পরে নিজের কর্তা আর ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু ততদিনে "কারকো" আর "কারকো" নেই, টিপ্যিকাল ইন্ডিয়ান চাইনিজ ! গতানুগতিক স্বাদ তার, যা আমি তুমিও রাঁধতে পারি !

২

আমাদের মফস্বলের পুজোয়: মাইক আর বাজির প্রাধান্য ছিল বেশি । পাড়ার পুজোয় যেতাম ঠিকই কিন্তু ঐ যে রক্ষণশীলতার লক্ষণরেখা অতিক্রম না করে যতটা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মাতামাতি করা যায় ভোরবেলায় উঠে মায়ের সাথে আমাদের বাগানে শিউলিফুল কুড়োনোর মজাই ছিল আলাদা । শিউলি, স্থলপদ্ম তুলে এনে মায়ের সাথে মালা গাঁথতে বসতাম । সেই মালা ঘরের মাদুর্গাকে পরানো হত । রোজ একটা করেমালা মা গাঁথতেন । বেশি হয়ে গেলে সেটি পাড়ার পুজোয় ঠাকুরকে দেওয়া হত । আমার কাজ ছিল শিউলির বোঁটা গুলো নখ দিয়ে ছেঁটে দেওয়া যাতে ঠাসা মালা হয় । আর সেই বোঁটার রঙ সারাদিন হাতে লেগে থাকত । হাতের নখ কমলা হয়ে যেত । খুব মজা পেতাম । শিউলিফুলের মালায় মাঝে মাঝে থাকত একটা করে স্থলপদ্ম । ব্যাপক সুন্দর লাগত আমাদের বাড়ির ! নিয়ম অনুযায়ী ষষ্ঠীর দিন সকালে মা বাড়ির প্রত্যেক দরজার মাথায় তেল, হলুদ আর সিঁদুরের স্বস্তিকা আঁকতেন । তারপর পুজো করতেন পুজোর শেষে আমাকে

দিয়ে ব্রতকথা পড়াতেন । দুর্গা ষষ্ঠীর ব্রতকথা যেখানে কিভাবে মাদুর্গার গায়ের ময়লা থেকে গণেশের জন্ম হয়েছিল সেই সব থেকে শুরু করে গণেশের মাথা কাটা যাওয়া আর শ্বেতহস্তীর মাথা এনে গণেশের মাথায় প্রতিস্থাপন করা । খুব মজা পেতাম আর ফাঁকে ফাঁকে ভাই আর আমি মুখ চাওয়া চাওয়ি করতাম কখন এই মহিলা রান্নাঘরে গিয়ে লুচির ময়দা মাখবে আর সাথে বসাবে ছোলার ডাল । আমরা আড়িয়াদহের বাঁড়ুজ্যে রা চিরকাল ভোজন রসিক । বাবা যেমন এখনও খেতে ভালবাসেন আর সেই সাথে খাওয়াতেও ভালোবাসেন । ষষ্ঠীর দিন আমাদের বাড়িতে আমরা চারজন ছাড়া আরো জনা দশেক লোক জন আসত । আসলে বাবার তো ঘোরার চাকরী ছিল রাজ্যের পুরোনো বন্ধু জ্যাঠামশাই, মামা, দাদা যাদের সাথে দেখা হত বলতেন "আসছিস তো পুজোর সময় ? খেয়ে যাস" মা বলতেন " আচ্ছা শোনো তোমরা কোথাকার জমিদার গো? আর এখনকার দিনে এমন কাজের লোকের হাল, তুমি এভাবে লোকজনকে নেমন্তন্ন করে আসো ক'টা আর্দালি, বাবুর্চি আছে তোমার যে তোমার খিদমত খাটবে? বাবা বলতেন দুটো লুচি, বেগুণভাজা, ছোলার ডাল আর মিষ্টি খাওয়াতে তোমার কি এমন কষ্ট হবে গো ? অগত্যা মাকে সক্কালবেলা থেকে সেই মত ব্যবস্থা করতে হত কাজের লোক এসে এক থালা ময়দা মেখে দিত আর রাশিরাশি বেগুণভাজা কেটে দিত । মা এক প্রেসার কুকার নারকোল কুচি আর হিং দেওয়া পুজো স্পেশাল ছোলারডাল রেঁধে বসে থাকতেন । মিষ্টি কিনে আনা হত । প্রথম গেষ্ট আমি আর ভাই তারপর বাবা, মা, কাজের লোক আর যে যখন আসবে তাদের জন্য । কিছু ভাজা লুচি আর বেগুণভাজা চাপা দেওয়া থাকত । সারাদিন ধরে ভাই আর আমি প্যান্ডেল থেকে এসে দুটো করে খেয়ে পালাতাম । বিকেল বেলায় নতুন জামা পরে আমি বেরোতাম প্রথমে ভাইকে নিয়ে । মানে সে আমার বডিগার্ড, হাতে ক্যাপ-বন্দুক আর চোখে প্লাসটিক সানগ্লাস । কিছুদূর হেঁটেই পায়ে ফোসকা । অগত্যা ব্যাক টু বাড়ি । রিক্সো নিয়ে সন্ধ্যের ঝুলে মায়ের সাথে যেতাম বরানগর ঠাকুর দেখতে । সে কি ভীড় !

৩

আমাদের স্কুল ছুটি পড়ে যেত পঞ্চমীর দিন। আর খুলে যেত ভাইফোঁটার পর । পুজোর ক'দিন বইপত্র শিকেয় তোলা থাকত । পুজোর প্রতিদিন সকালে বাবা নিয়ম করে চালিয়ে দিতেন গ্রামাফোন চেঞ্জার । আর একে একে সানাই, শরদ, সেতার দিয়ে শুরু করে নতুন গানের এলপি রেকর্ড অবধি সেই কলের গান বাজতে থাকত । বছরে এই একটা সময় নিয়ম করে বাবা সেই শব্দ যন্ত্রটির পরিচর্যা করতেন পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে । আজো সেই পুরোণো আধুনিক গান গুলো রেডিওতে শুনলে মনটা যেন কেমন করে কেঁদে ওঠে শিউলির গন্ধে, পুজোর ঢাকের আওয়াজে । মনোবিদ্যায় যাকে বলে "law of association" সব চেনা চেনা গন্ধ হাওয়া , শিশির ভেজা শরতকাল ছুট্টে এসে মনের দোরে কড়া নাড়ে । একবছর কেনা হয়েছিল হেমন্ত, মান্না, আরতি, প্রতিমা, শ্যামল, সন্ধ্যা, অনুপ ঘোষালের সাতটা ছোট 45rpm এর রেকর্ড । এইচএমভি থেকে বেরিয়েছিল । আর সবচেয়ে মজা হল দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সাতটা ছোট রেকর্ড একসাথে ঐ চেঞ্জারে বসিয়ে সেট করে ঘুমিয়ে পড়লে নিজের থেকেই একটা একটা করে বাজতে থাকবে । যতক্ষণ না ঐ সাতটা সম্পূর্ণ

না বেজে থামে । খুব মজা হত নতুন গান । যা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বাজছে তা আবার আমাদের বাড়িতেও বাজছে । অনুপ ঘোষালের “বিয়ে করবই না”, আরতির “বন্য বন্য এ অরণ্য ভালো”, হেমন্ত’র “আমিও পথের মত হারিয়ে যাব” মান্না দে’র ” ক’ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ তুমি ” সন্ধ্যা’র “গহন রাতি ঘনায়” এই গানগুলো আমাকে তখন ছুঁয়ে গেছিল তাই বোধ হয় আজো মনের কোঠরে পড়ে রয়েছে তলানি হয়ে । সেবার এই গান গুলোই কিন্তু বেরিয়েছিল পুজোর গান হিসেবে । সালটা বোধ হয় ১৯৭৩ কি ১৯৭৪ হবে সঠিক মনে নেই । এখন কার ছোটরা দেখি পুজোর সময়ও কম্পিউটার গেম খেলছে নয়ত টিভি খুলে ঘন্টার পর ঘন্টা কার্টুন দেখছে । তাদের ঠেলে ঠুলে প্যান্ডেলে পাঠাতে হয় আরতি দেখার জন্যে আর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়ে আসার জন্যে ।

সপ্তমীর দিন সকালে সব প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসত নবপত্রিকা বা যাকে আমরা বলি “কলা বৌ” তার স্নান করানোর ধুম । আলমবাজার গঙ্গার ঘাট খুব কাছে বলে আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যেত সকাল থেকে শুধু ঢাকের আওয়াজ । সেই আওয়াজ শুনে মনে পড়ে যেত “আজ সপ্তমী” । প্রত্যেকবার মা পড়া ধরার মত করে জিগেস করতেন নবপত্রিকার পুজো মানে আসলে মা দুর্গার পুজো। অত বড় মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে তো আর গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করানো যায় না তাই নব পত্রিকা বা কলাবৌ কে নিয়ে যাওয়া হয় । আর ভাই কেবলি বলত ওটা তো গণেশের পাশে থাকে তাই গণেশের বৌ । মাদুর্গা কেমন করে গাছ হবে ? মা তখন আবার ব্যাখ্যা করে দিতেন যে ন’রকমের উদ্ভিদ যেমন বেল, ডালিম, কচু, মান কচু, হরিদ্রা, অশোক, ধান, কদলী, আর জয়ন্তী গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতা গাছ দিয়ে বেঁধে দিয়ে নব পত্রিকা বানানো হয় । আর আসলে তাঁকেই ঐ চারদিন ধরে পুজো করা হয় । শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার প্রতীক রূপে মা পূজিতা হন ।

সপ্তমীর দিন আমিষ পদ রান্না হত । মাছের মাথা দিয়ে ডাল, ফুলকপি দিয়ে ভেটকি মাছ , চিংড়ির মালাই কারী এই সব বিশেষ পদ । আর সেদিন বিকেলে আমরা রিকশোতে করে আড়িয়াদহে আর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দেখতে যেতাম বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রিকশা ভাড়া করা হত । বিরাট বিরাট পুজো হয় ঐ দুটি পুরোণো সাবেকী অঞ্চলে । মাঝে মাঝে হল্ট নেওয়া হত মামার বাড়িতে আর জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে । জলযোগ এবং বিয়োগ করে এগুনি হত আর সারা হত ঠাকুর দেখার পর্ব । একবার পুজোর ঠিক আগে আমার এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল । সে বছর কেবল বাদ ছিল । ভীড়ের গোঁতা গুতিতে আমার যদি ব্যাথা লাগে তাই । সে বছর আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি আর আমার ভাই | বেচারা আমার জন্য বাড়িতে বন্দী হয়েছিল । তবে তার ক্যাপবন্দুকের গুলিতে আমার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল সেতো তোমরা আশা করি বুঝতেই পারছো ।

৪

পুজোর অষ্টমীর দিন ভোর থেকে উঠে অঞ্জলি দেবার প্রস্তুতি । একে একে স্নান সেরে সবচেয়ে ভালো আর দামী জামাটি পরে অঞ্জলি দিতে যাওয়া হত । নির্জলা

উপোস করে মায়ের সাথে যেতাম প্যান্ডেলে। বারোয়ারি তলায় পুজোর গোছগাছ হতে দেরী হয় বলে প্রায় দশটা এগারোটা বেজে যেত। মা সারাবছরের ষষ্ঠীর প্রণামী তুলে রেখে একটা বড় পুজো দিতেন ঐদিন মা দুর্গাকে। আমাদের বাড়িতে আবার অষ্টমীর দিন নিরামিষ খেতে হয়। বিয়ের আগে পর্যন্ত এভাবেই কাটত ষষ্ঠী, সপ্তমী আর অষ্টমী। বিয়ের পর প্রথম বছর কেটেছিল দক্ষিণ কোলকাতার পুজো দেখে। তার পরের বার আমার ছেলে হওয়ায় পুজো একদম বরবাদ।তার পরের বছর অর্থাত ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ অবধি ছিলাম জামশেদপুরে স্টিল সিটিতে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে আমাদের টাটা স্টিলের ফ্ল্যাট ছিল দলমা পাহাড়ের গায়ে। সুবর্নরেখা ফ্ল্যাটের হাউসিং কমপ্লেক্সের পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৮৯ সালে যেবার আমরা ওখানে প্রথম গেলাম। আর তৃতীয়বছর থেকে আমি আমার এক বছরের ছেলেকে নিয়ে পুজোর কালচারাল দিকটা দেখতে শুরু করেছিলাম। কোলকাতার পুজো দেখার পর জামশেদপুরের পাহাড়নদী বেষ্টিত- জলবায়ুতে ফাঁকা সবুজের মধ্যে প্রতিমা আনতে যাওয়া থেকে বিসর্জন অবধি সব এত কাছ থেকে দেখেছিলাম যে নতুন করে দুর্গাপুজোকে আবিষ্কার করেছিলাম। সে বছর ফ্ল্যাটের সব ছোট মেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে নৃত্যনাট্য করেছিলাম আমরা কয়েকজন মহিলা মিলে। পরের বছরও সে রকম একটা প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলাম আমি। সেবার আমার একক গানের প্রোগ্রাম ছিল নবমীর দিন। নাম ঘোষণার পর যখন আমি স্টেজে উঠতে যাব তখন আমার দু'বছরের ছেলে বলে উঠল "আমিও যাব মামমামের সঙ্গে"। তাকে বারণ করল তার বাবা। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বলল আমি কিচ্ছু করব না শুধু মামমামের পাশে বসে থাকব চুপটি করে। সত্যি তাই হল আমার তিনটি গানের সময় আমার ও তবলচির মাঝে সে বসে রইল ঘটের মত, গান শেষ হল সেও আমার সাথে নেমে এল স্টেজ থেকে। বাড়ি ফিরে জিগেস করলাম "এমন করলি কেন" সে বলল "যদি তোমাকে ওরা কোথাও নিয়ে চলে যায়"! আজ এখনো সে সব কথা ভাবলে খুব হাসি পায় সে ! র পর দিন মা কে ছেবেচারা দিনেড়ে হস্টেলে থাকে !

আমার স্বামী পৃথ্বীশ কোলকাতায় চাকরী নিয়ে চলে এলেন ১৯৯৫ সালে। সেই থেকে প্রতিবার পুজোয় জামশেদপুরের হাউসিং এর পুজো খুব মিস করি আমি। তখন থেকে আমার পুজোর মানেই আমার ছেলে রাহুলের পুজো। যদিও সে বড় একটা ঠাকুর দেখা, ভীড়ে ঘোরাঘুরি পছন্দ করেনা তবুও আমরা একবার বাড়ির বরিষ্ঠ নাগরিকদের নিয়ে তীর্থযাত্রার মত ওয়েষ্টবেঙ্গল ট্যুরিজম এর বাসে চেপে দেখতে গেছিলাম কোলকাতার সাবেকী সব বাড়ীর বনেদি স্টাইল পুজো। আধুনিক "থিম" এর দুর্গাপুজোর চেয়ে অনেক মন কাড়ে এই পুজোগুলি। আমরা সে বার ধর্মতলা থেকে বাসে চড়ে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের পুজো, জানবাজারে রাণি রাসমণির বাড়ির পুজো, শোভা বাজারের রাজবাড়ির পুজো , উত্তর কোলকাতার বিখ্যাত লাটুবাবুছাতুবাবুদের পুজো- দেখেছিলাম সপ্তমীর দিনে। ডাকের সাজের প্রতিমা, চন্ডীমন্ডপে সুদৃশ্য চালচিত্রে বিশাল আয়োজন , বাড়ির মহিলাদের সাবেকী গয়না ও বেনারসী শাড়ি পরে মায়ের পুজো গোছানো, মাদুর্গার ও সব শাড়িগয়নায় প্রাচীন- ঐতিহ্যের ছাপ সব কিছু দেখলে পুরোণো বাঙলার সেই সাবেকীয়ানা এখনো যে বেঁচে আছে এ শহরের কোথাও কোথাও তা বেশ ভাল লক্ষ্য করা যায়।

৫

আর একবার মনে পড়ে আমরা একটা গাড়ি নিয়ে বেলুড় মঠে কুমারী পুজো দেখতে গেছিলাম । সেখানেও খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয় কিন্তু আজকাল ধর্মের নামে যে হুজুগের স্রোতে আপামর বাঙালি মেতে উঠেছে তা বেলুড় মঠের ভীড় দেখলে বোঝা যায় । পুজো এখন ফ্যাশানেবল হয়ে উঠেছে । প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আলোর রোশনাইয়ের সাথে অণুরণিত হয় একদিকে মহিষাসুরমর্দিনীর স্তোত্র আর ডিজিটাল এল সিডি স্ক্রীনে সব কত রঙচঙে বিজ্ঞাপন আর সেই সাথে থরে থরে সাজানো ফাস্টফুডের গরমাগরম হাতছানি। একএকটি বারোয়ারী পুজো এখন স্পনসর্ড পুজো ; এক এক কোম্পানির সম্পত্তি, এক একটি মিডিয়া তাদের কিনে নিয়েছে ঐ পাঁচটি দিনের জন্য । প্রতিযোগিতার মাপকাঠিতে মা আসেন পূজিতা হতে । পুজো এখন একটা প্যাকেজ ! সেরা প্যান্ডেল, সেরা প্রতিমা, সেরা দর্শক শ্রীমতি, সেরা সেরা আরো কত কিছুর ভীড়ে কিন্তু আসল পুজো একটু একটু করে সরে যাচ্ছে পুজোর মূল, আদি, অনাদি আবেদন থেকে । এখানেই গ্রামের পুজোর সঙ্গে শহরের পুজোর তফাত ; যে দেশে এখনো এত গুলো মানুষ বিপিএলের নীচে সেখানে আধমাইলের ব্যবধানে কি দুর্গাপুজো করা খুব জরুরী সেটাই আমার কাছে একটা লক্ষটাকার প্রশ্ন ! আমরা কি দশটা প্যান্ডেলকে নিয়ে একটা করে পুজো করতে পারিনা ? ভুলে যাই না কেন যে এই পাঁচটাদিন আমরা সকলেই এক মায়ের ছেলে কেন পারিনা হাত মিলিয়ে পুজো করতে !? কেন পারিনা বিসর্জন দিতে “আত্মস্বার্থটুকু” ? তোলাবাজি, ধান্দাবাজি আর দলবাজি কেন সরিয়ে রাখতে পারিনা ঐ ক’টা দিনের জন্য?

স্মৃতির ক্যানভাস থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে সেই কৈশোরের পুজোর মজা, ফিকে হয়ে এসেছে অষ্টমীর বিকেলের গোধূলি রঙ। তবুও রঙ তুলির টানে জিইয়ে রেখেছি সেই ক্যানভাসের ছবি । সেই নবমী নিশির ধুনুচি নাচ, পাড়ার ছেলেদের সিটির আওয়াজ, তা দেখে মায়ের বকুনি, কত না বলা কথারা, হারিয়ে

যাওয়া বন্ধুত্ব ফুচকা ওলার তেঁতুল জলের রহস্যে পাক খেতে খেতে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক দূরে ভেসে ভেসে চলে গেছি স্রোতের টানে। এখন ভালো লাগে না ভীড়, শহরের ধূলোমাখা মাদুর্গার মুখ, ধোঁয়া মাখা গঙ্গার পাড়ে দশমীর বিসর্জনের কাঁসর ঘন্টা। সকলকে নিয়ে প্রতিবছর চলে যাই শহর থেকে অনেক দূরে , বোলপুরের একটা গ্রামে, প্রান্তিকে। "সোনারতরী১-" আবাসনে ছোট্ট দুগ্গা পুজো হয়; মায়ের ভোগ রান্নার যোগাড় করি, প্রসাদ বিতরণ করি, মায়ের সামনে বসে গান করি, ছোটদের উত্সাহ দিই আর ঐ পুজোর ম্যাগাজিন "স্মরণিকায়" প্রতিবছর লিখি। পায়ে হেঁটে দশমীর দিন আবাসনের সকলে মিলে ক্যানেলের জলে মা কে ভাসান দিয়ে আসি। মাদুগ্গা ভাসতে ভাসতে চলে যান খোয়াইয়ের অববাহিকায় । সকলে মিলে অদ্রিজার জয় দিয়ে ফিরে আসি । মা এখনো দশমীতে কুচো নিমকি, নারকেলের চন্দ্রপুলি আর ঘুগনি বানান।

অন্য পুজো

অধরামাধুরী

গ্রামের নাম পঞ্চানন্দপুর । আকাশে শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এখনও ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে । অর্থাৎ কন্যা তুমি বেশি উচ্ছল হয়োনা আমি এখনই বুকভরা অভিমান নিয়ে ঝরে পড়তে পারি। বর্ষার সাক্ষ্য এখনও বয়ে নিয়ে চলেছে রাস্তাঘাট। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাদামাটির রাস্তায় গর্জন তুলে আমাদের 'টাটা সুমো' এদিক ওদিক বাঁচিয়ে 'হপ আ লিটিল জাম্প আ লিটিল' ছন্দে চলেছে ।পেছন পেছন কিছু আধ ন্যাংটো শিশুর দল এক হাতে ঢিলে প্যান্ট ধরে কেউ কেউ দুহাতেই ধরে দৌড়ে চলেছে। অপেক্ষাকৃত বড়গুলো সরল এক কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে যতদূর চোখ যায় ।

' সদানন্দ রায়ের বাড়ীটা কোনদিকে?'

'হামাদের মাষ্টারমশায়ের কথা বুইলছো কি?'ছেলেটার চোখ সরু করে বলে।

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নে আমরা একটু দ্বিধায় পড়ে যাই । বিশ্বজিত বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাইমারী স্কুলের টীচার উনি'!

' সোজ্জা গিয়ে ডাহিনে আমিনা খালার বাড়ি ওখান থেকে পায়ে হাঁইটতে হইবে। গাড়ী ঢুইকবে না' ।

আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে একটা চকোলেট দিলাম । ঠিক যেন চিনির গন্ধ পেল পিঁপড়ে । এদিক ওদিক থেকে উঁকি মারা উৎসাহী শিশুর দল গুটি গুটি এগিয়ে এল। চাহিদা নেই কোন ওদের শুধু মুখে এক অপার সারল্য আর চোখ আমার ঝোলা ব্যাগের দিকে।

'নাও ঠেলা সামলাও এবার' ......বিশ্বজিত হেসে ফেলল।

'কিরে কি নিবি' আমি হেসে জিজ্ঞেস করতেই এর ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল ।আমি আস্তে করে ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আরো কটা 'এক্লেয়ার্স' বের করে আনলাম। ওই আনাটুকু অব্ধি তাদের ধৈ্য্যশক্তি প্রশংসনীয় কিন্তু তারপরেই শিশুসুলভ ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠপাট করার প্রবণতা দেখে আমিও একটু ঘাবড়ে গেলাম।

বিশ্বজিত বলল 'সুতপাদি আর এখানে বের করে কাজ নেই একেবারে স্পট এ গিয়েই বের কোরো' ।

আমিনা খালার বাড়ি অব্ধি গাড়ীটাকে নিয়ে যেতে গিয়ে ড্রাইভারের কেরামতি দেখার মত। শহরের প্রশস্ত রাস্তায় ১০০কিমি বেগে গাড়ী চালানোর মধ্যে এ কেরামতি দুস্প্রাপ্য । ড্রাইভার প্রায় আর্ধেক শরীর জানালার বাইরে বের করে গজ,ইঞ্চি মেপে গলিটার মধ্যে গাড়ীটাকে ঢোকালো। ঢুকতেই যা কষ্ট ...এরপর প্রশস্ত মাঠ ।এক চক্কর ঘুরে এসে গাড়ী থামল । আমাদের চেয়েও গাড়ী এবং গাড়ীচালক- স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যেন।

পাড়াটা শান্তশিষ্ট ।চারিদিকে আমের গাছ ইতঃস্তত মাটির বাড়ী । তারই মাঝে টিনের চালা দেওয়া একটি ঘর নজরে এল। গাড়ীর আওয়াজে ছাপোষা চেহারার প্রায় বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পায়ে হাওয়াই চটি আর পাজামা পাঞ্জাবীর কোঁচকানো অবস্থা বলে দিচ্ছে গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে হাতের সামনে যা ছিল সেটাকেই পরে এসে উনি আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। গ্রামে এ হেন বেশভূষাই মানী ব্যক্তিদের জন্যে যথেষ্ট ।

‘বিশ্বজিত ফিসফিস করে, ‘ কুড়ি বিঘা জমির মালিকের হাল দেখ!’

‘বলিস কি রে!’ আমি আঁতকে উঠলাম।

‘নমস্কার মাষ্টারমশাই ......আমরা ‘পরিব্রাজক’ থেকে এসেছি’।

‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের কথা বলে রেখেছি আমি । গ্রামের অবস্থা তো জানই । আগে থেকে প্রোগ্রাম ছকে না রাখলে সামান্য দান নিয়ে দলাদলি , মারদাঙ্গা হয়ে যাবে ......’

‘ আপাতত দুশোটা শাড়ী এনেছি’ আর বাচ্চাদের জন্যে কিছু চকোলেট ।

‘ সে ঠিক আছে । আমি মোহন কে খবর দিয়ে দিচ্ছি ওরা এখনই নিয়ে আসবে মহিলাদের ....ততক্ষণ তোমরা হাত মুখ ধুয়ে চা টা খাও।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করতেই ছোট্ট একটা ফ্রক পরা মেয়ে ভেতরবাড়িতে নিয়ে গেল। উঠোনের মাঝখানে তুলসীবেদী , একপাশে লাউমাচা ।জংলা প্রিন্টের শাড়ী পরা একজন মহিলা আমাদের দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন ।বুঝলাম ইনি মাষ্টারমশায়ের সহধর্মিণী । উঠোনের এক কোণে রান্না ঘর ।দাওয়ায় রাখা চকচকে স্টিলের বাসনের ওপর রোদ ঠিকরে পড়ছে। অনেকদিন পর স্থলপদ্মের গাছ চোখে পড়ল, কয়েকটা রয়েছে এখনো গাছে ।বেলা হয়ে যাওয়ায় গোলাপী আভা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে । মাস্টারমশায়ের স্ত্রী সযত্নে আমাদের চাটাই পেতে বসতে বললেন। শাড়ীগুলো বের করে সধবা ও বিধবাদের গুলো আলাদা করতে লাগলাম কারণ আমাদের খুব চটপট কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে হবে । এখানে গোলমাল হওয়ার একটা সম্ভাবনা আসার আগে থেকেই ইঙ্গিত পেয়েছি।

মাষ্টারমশাই চারিদিকে বার্তা পাঠিয়ে এসে গুছিয়ে বসলেন । ওনার কথা অনুযায়ী বোঝা গেল সরকারী দান নিয়ে নানা খেলা চলতে থাকে । কারো মাথায় পাঁচটা তেরপল তো কারো মাথায় শুধুই আকাশভাঙ্গা বর্ষা ...... কিন্তু মা গঙ্গা তো আর রাজনীতি বুঝে ঘর ভাঙ্গে না ......কাজেই যারা যেই তিমিরে তারা সেই তিমিরেই থেকে যায়। আমাদের মত কিছু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু তাদের বাড়ীর মেয়েদের লজ্জা নিবারণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করতে পারে মাত্র।

চা পর্ব শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আমরা অবাক । হাড় জিরজিরে কোনোরকমে ন্যাকড়া জড়ানো গায়ে একদল মহিলা লাইন দিয়েছে বাড়ির সামনের ফাঁকা অংশে। পুজো শুধু উপলক্ষ্য ছিল মাত্র। শাড়ী প্রদানের তালিকায় কেউ ছিল আমিনা বিবি কেউ ছিল ফতেমা বেওয়া কেউ বা গৌরী দাস। প্রকৃতির নির্মম পরিহাস তাদের জীবন থেকে ঈদ্‌ আর পুজোর খুশী ছিনিয়ে নিয়েছে । শাড়ী

পাওয়া নিয়ে তাই উৎসবের কোন আঁচ নেই এখানে। প্রথমটায় অভ্যাসবশতঃ যেভাবে স্কুলের বাচ্চাদের চকোলেট দিতাম সেভাবে দিয়ে গেলাম।মাষ্টারমশায় একবার এসে সাবধান করলেন। কেউ কেউ দুবার এসে নিয়ে চলে যাচ্ছে কারণ কারোর মুখই আমরা চিনিনা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বিলি শেষ ।আমরা বাচ্চাদের চকোলেট দেব বলে চকোলেট বের করছি এমন সময় হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল একটি অল্পবয়সী বৌ ......জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে সে শাড়ী দেওয়ার খবর সঠিক সময়ে পায়নি তার শাড়ী অন্য কেউ নিয়ে গেছে ।তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে হঠাৎ মনে পড়ল সাদা খোলের পাড়ওয়ালা একটা শাড়ী এখনো ব্যাগ এ আছে। লাউডগার মত কচি বউটার হাতে মহালয়ার দিন সাদা শাড়ীটা দিতে হাত কেঁপে গিয়েছিল আমার। বৌটি করুণ চোখে শাড়ীটি দেখতে দেখতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনের ভিতর একরাশ মেঘ ভিড় করে এল ......আর কটা শাড়ী আনলেই তো হোতো ......কিন্তু আর কটা ? আর কটা? আর কটা শাড়ী হলে দেশের লজ্জা ঢাকা যায়?

চকোলেট নিয়ে সমস্যা হয়নি। অফুরন্ত চকোলেট দিয়ে আমরা মাষ্টারমশায়ের কাছে বিদায় নিলাম । যাওয়ার পথে বিশ্বজিত বলল, ‘ভাঙ্গান দেখতে যাবে সুতপাদি’?

‘এত কাছে এসেছি যখন চল দেখেই যাই’ ......

মিনিট দশেকের মধ্যে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা বেয়ে চলে এলাম নদীর ধারে । কি ভয়ঙ্কর সে রূপরাশি রাশি জলরাজি রক্তচোখ দেখিয়ে আছড়ে পড়ছে ! পারে আর একটু একটু করে মাটিকে টেনে নিচ্ছে নিজের কোলে। দূরে চোখ রাখতেই ভেসে উঠল কয়েকটা ঘরবাড়ির ভগ্নস্তুপ । হঠাৎ নজরে এল এক মহিলা নৌকো বাইছেন।

‘ওটা কে রে?নৌকো চালাচ্ছে?’ পাশে দাঁড়ানো বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলাম ।

‘ওটা আমার চাচী ......চাচার নৌকা ছিল, ওই পারে লিয়ে যেত ......চাচা বানে ভাইসে গেল ...ছেইলেমিয়াগুলাকে খাওয়াইবে কে ... তাই চাচী নৌকা চালাইছে’ ।

অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।দূরে কাশের বন হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে ...... সামনে উত্তাল গঙ্গা .....মেঘের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে মাঝনদীতে দাঁড় বাইছে অন্য দশভূজা

আমার পুজোর ছুটি

নিতা

খুব ছোটবেলার পূজোর স্মৃতি হচ্ছে রাতে প্রচন্ড ভিড়ে ঠাকুর দেখা, নতুন জুতো পড়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা...একবার কোন ভিড়ে কেউ পা মাড়িয়েও দেয়, সেটা বেশ মনে আছে!

তখন পূজোয় বেশ ক'টা জামা হত। পাপা দিত, পিসি, কাকা-কাকিরাও দিত। তবে তখন জামার সুন্দর সুন্দর পিস্ আসত। বাড়িতে অনেকগুলো মেয়ে সব একই কাপড়ের একই ধরনের জামা পড়তাম। তখন ওয়ান-টুতে পড়ি। এখন হলে মুখ দেখা বন্ধ হয়ে যেত!

এরপরে একটু বড়বেলায় পূজোর ছুটিতে হস্টেল থেকে জলপাইগুড়ি যেতাম ট্রেনে চেপে। সেটা দার্জিলিং মেলে রাতের ট্রেনে। হুহু করে খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া দিত, একদম পাশে থেকে চাঁদ সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকত! আহাঃ! সেটাই সব সময় প্রচন্ড উপভোগ করতাম।

আমরা দু-চারটি মেয়ে খুব দেরি করে বাড়ি যেতাম। মনে পড়ে ছুটিতে হোস্টেল ফাঁকা হয়ে যেত। আমাদের বড় হলের খাটগুলো সব ওই ধারে একটার উপর একটা ডাই করে রাখা থাকত। পুর ঘরটা খাঁ খাঁ করত। স্কুলও থাকত না। মনটা হু-হু করত।

তবে এসময়ও সঙ্গী পেতাম এসো.এস ভিলেজের কতগুলো দিদির মধ্যে শিখাদিকে। তাদেরও বাড়ি থেকে দেরিতে নিতে আসত। ছোটদের মধ্যে আমিই কেবল থাকতাম। আর দু-চারটে এইট-নাইনে পড়া দিদি। দিদিদের দলে ভেড়া যেত না। তবে শিখাদি নিজেই কেমন আমাকে কাছে টেনে নিত।

সবিতাদি আমাদের দেখা শোনা করতেন। তিনি কাজে বেরনোর সময় আমায় বড় লাইব্রেরি থেকে ছোটদের বই থেকে পড়া দিয়ে যেতেন, এসে ধরবেন। অধিকাংশই মহাপুরুষদের জীবনী। তখন বই পড়ি খালি চাচা চৌধুরী। খুব বাজে লাগত! কিন্তু সবিতাদি বেশ রাগি ছিলেন। তো, শিখাদি আমায় ছাদে বসে বসে গল্পের ছলে সে সব পড়ে শোনাত। এভাবে ধিরে ধিরে আমি বই পড়তে শিখি।

জলপাইগুড়িতে মনে আছে যখন শিল্প সমিতি পাড়ায় থাকতাম সামনেই বিশাল বিশ্বাস বাড়ির সামনের মাঠে পূজো হত। নতুন জামা পড়ে অঞ্জলি দিতে যেতাম। পরে আসাম মোড়ে চলে যাই। ওখানটা খুব ফাঁকা। কয়েকঘর বাড়ি। তাই অঞ্জলি দিতে কলেজের পাশে অমিতদাদের পাড়ায় চলে যেতাম।

পাপা একদিন বিকেলবেলা সবাইকে নিয়ে টাউনে যেত। ঘুরে ঘুরে জামা-জুতো কেনা হত। পাপা বেশি ঘুরতে পছন্দ করত না। আর কেমন যেন মনে হয় আমাদের চাহিদাও অনেক কম ছিল। বেশ একটা দোকান থেকেই মনের আনন্দে জামাকাপড় কিনে নিতাম। তারপর ভাল কোন দোকানে রাতের খাবার খেয়ে ফেরা হত। পাপা নিজে উত্তাপম্ বা ধোসা খেত। আমরা মোগলাই খেতে খুব ভাল বাসতাম।

অষ্টমীতে সকালে অঞ্জলি দেওয়া হত। দুপুরে লুচি খাওয়া মাস্ট! রাতে পাপা রিক্সা ঠিক করে রাখত। আমরা রিক্সায় করে সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখতাম টাউনে। তরুন দল, দিশারী, রাজবাড়ি আরো অনেক! এখন নাম মনে পড়ছে না।

রাতে আবার যখন বাড়ির রাস্তা ধরতাম তখন পথ শুনশান। আমাদের ওদিকটা খুব অন্ধকার হয়ে যেত, রাস্তায় আলোও ছিল না। রিক্সার সামনে কুপি জ্বালান হত। পাপা বড় টর্চ সব সময় রাখত।

বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হত। কিন্তু যত বাড়ির কাছাকাছি শুনশান রাস্তা দিয়ে গুটিসুটি মেরে ফিরতাম অদ্ভুত একটা আরাম লাগত! এতক্ষণ প্রচন্ড ভিড় হৈ হুল্লোড় থেকে হঠাৎ অন্ধকার চুপচাপ পথ কিন্তু অজস্র জোনাকি যেন আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকত। তাদের দেখলেই মন ভাল হয়ে যেত। আর ছিল ঝিঁঝির ডাক।

মোটামুটি দুদিন ঠাকুর দেখা হত। দশমীতে ভাসানে জলপাইগুড়িতে আবার এখানের কালীপূজোর মত বাজি ফাঁটান হত। আমদের যদিও পাপা কালীপূজোতেই বাজি-পট্‌কা এনে দিত।

মাঝে আমার ভাই হোস্টেলে চলে যায়। সে সময়টা আমি আরো একা হয়ে পড়ি। তবে আমারও কেমন নিজস্ব একটা জগৎ ছিল তাই নিয়ে বেশ থাকতাম। কালীপূজোর দিনও আমরা টাউনে ঠাকুর দেখতে আসতাম আর টাউনেই রাতে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরতাম।

কলকাতায় আসার পর বোনেদের সাথে নিউ মার্কেট, দক্ষিণাপণ, বর্ধনমার্কেট, শ্রীরাম মার্কেট থেকে খুব কেনাকাটা করি পূজোর বেশ অনেক আগে থেকেই। আবার বেদীতে জামা বানাতেও দেওয়াও হয়। গড়িয়াহাট থেকে ঘুরে ঘুরে আরো অনেক কিছু কেনাকাটা করা হয়। কলকাতায় আর পাপাকে নিয়ে পূজোর বাজারে ঘুরতে হয়নি। তবু পাপার সাথে অন্য সময় পাপার হাত জড়িয়ে ধরে ঘুরতে খুব মজা। যা চাইবে পাবেই পাবে। পাপা বড় দোকানে ঠান্ডা ঘরে বসিয়ে এত্তো এত্তো খাবার অর্ডার করবে। কদিন আগে রাহুল গান্ধী এসে ভজহরিতে খেয়ে গেল। পাপা প্রায়ই নিয়ে যেত।

কলকাতাতেও পাপা ঠাকুর দেখার জন্য গাড়ি ভাড়া করত সারা রাতের জন্য। নিজে খুব একটা যেতে চাইত না। জোর করে নিয়ে যেতে হত। পাপা গাড়ি থেকে নামতও না। তবে কলকাতায় রাতেও সাঙ্ঘাতিক ভিড় হয় বলে একবার দিনেও গাড়ি ভাড়া করে খুব ঘুরেছি।

একবার পূজোয় আমরা পুরীতে ছিলাম। ওখানেও দারুন পূজো হয়। রাতে সমুদ্রের ধারে পাপা জমিদারের মত একগাদা গদিআটা চেয়ার ভাড়া করে আরাম করত। আমরা বালিতেই আনন্দ করতাম।

এখন পাপা নেই। পূজো আসলেই পাপাকে মিস করি। পাপা যদিও শুরুতে চিরদিন থাকবে। পাপা চতুর্থীতে চলে যায়। সেবারও পূজোয় বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎই পাপা চলে গেল।

শিউলিফুলের গন্ধ

মহাশ্বেতা

দুর্গার পুজো

সন্ধ্যা বেলা হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ার সাথে সাথে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চিনে ফেললাম গন্ধটা। এদিক সেদিক খুঁজতেই চোখে পড়ল গাছটা, একটা পাঁচিলের পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ছোট্ট ঘুমন্ত ফুলগুলির মনমাতানো সুবাস জানিয়ে দিচ্ছে চুপিচুপি – পুজো এসে গেছে।

মন খুশী খুশী হয়ে গেল। শিউলিফুলের গন্ধটা মনে পড়িয়ে দিল কত ভুলে যাওয়া কথা। ছোটবেলায় পুজো মানেই ছিল বাবা, মা, ভাই আর আমি – সবাই মিলে ট্রেনে চেপে চন্দননগরে দাদুর বাড়ি যাওয়া। সে যে কি আনন্দ সেখান – বাড়ি ভর্তি কাকা পিসির দল – পড়াশোনা বন্ধ, খালি খেলা আর ঠাকুর দেখা, মেলায় যাওয়া আর খেলনা কেনা।বাবার শাসন ও অনেক কমে যেত ঐ কদিন।

পুজো আসার দুই এক মাস আগে থেকে নতুন জামা কেনা হত। মামা আসতেন নতুন জামা কিনে দিতে। মনে সবসময় কি যেন একটা আনন্দ... এবার ট্রেনে চেপে বেড়াতে যাওয়ার দিন এল। কিন্তু সত্যি সত্যি যে যাচ্ছি, সেটা বুঝতে পারতাম যখন আলমারির মাথা থেকে নামত লাল চামড়ার কিট ব্যাগ; রান্নাঘরের কোণা থেকে বের করে পরিষ্কার করা হত সবুজ কম্বলে মোড়া জলের বোতল - কম্বলে মোড়া থাকত জল ঠান্ডা হবে বলে; আর বেরোত বাবার একটা জামা – নীল -কালো ফুটকি ফুটকি ছাপ। বাবা ঐ জামাটা একমাত্র ট্রেনে চেপে বেড়াতে গেলে পরতেন। ইশকুলে পরাতেন তো, তাই সারাবছর গম্ভীর গম্ভীর সাদা, ছাই, হালকা নীল,এইসব একঘেয়ে জামা পরতেন। পুজোর কদিন বাবা মনে হয় ঐ জামাগুলোকেও ছুটি দিতেন।

সব মনে পড়িয়ে দিল সন্ধ্যাবেলার শিউলিফুলের গন্ধ। সেই লাল ব্যাগ টা ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। সবুজ জলের বোতলটাতো একবার ট্রেনে হারিয়ে গেছিল। বাবার সেই ফুটকি ফুটকি জামাটা পরে পরে খারাপ হয়ে গেছে বলে আলমারিতে তুলে রাখা আছে। বাবা ওটা এখন আর পরেন না। আমিও বড়ো হয়ে গেছি। ট্রেনে চাপতে গেলে আনন্দের বদলে ভিড় দেখে বিরক্ত হই। কিন্তু শিউলি গাছকে দেখ একবার !! ঠিক প্রতি বছর ফুল ফুটিয়ে , সেই ফুল ভোরবেলা ছড়িয়ে জানান দেয় – শরত্কাল এসেছে। পুজো এসেছে। ঘরে ফেরার সময় হল।

দুর্গাপূজা এসে গেলো

অতনু ব্যানার্জী

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।এক্ষুনি পাউডারের কৌটো থেকে পাফ তুলে একটু ফর্সা হওয়ার আপ্রান চেষ্টা চালাচ্ছিলো।চুলগুলো চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে আঙুল দিয়ে কুঁকড়েও নিলো একটু !ঘাড়ের দিকে জামার ওপরে পাউডারের সাদা গুঁড়ো গুলো ছ্যাট ছ্যাট করে ঝেড়ে নিলো...কেমন খুশকির মতো লাগছিলো!আজ ও ছোটমামার দেওয়া টি শার্ট আর জিন্স প্যান্ট পড়েছে।জুতোটাও পায়ে গলিয়েছে ... বাবার সাথে বাটার দোকান থেকে যেটা কিনেছিলো দিনকয়েক আগে।বাঃ বেশ স্মার্ট লাগছে তো! নিজেকেই আয়নায় দেখে ছেলেটা।ওদিকে বাইরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের ক্লাস সেভেন এর গ্যাং।সৌরভ,অর্ঘ্য,অরুন সাহু,টুবাই-বুবাই,বুলেট...আরো অনেকে।ডাকাডাকি করছে...ওরে এবার বেরো!ছেলেটার পা দুটো আটকে গেছে ভেতরঘরের ড্রেসিংটেবিলের সামনে।কেমন লজ্জা লজ্জা করছে সব কিছু ‘নতুন’ পরে ওদের সামনে বেরোতে!ও জানে বেরোলেই একবার সকলে হুল্লাট চেঁচিয়ে উঠবে... ওরে না না ...কি লাগছে গুরু!!! এসব লজ্জা টজ্জা কাটিয়ে ‘মা আসছি’ বলতেই দৌড়ে এলো মা রান্নাঘর থেকে।‘দাঁড়া দাঁড়া’ বলে ছেলেটার বাঁ হাতটা তুলে কড়ে আঙুলের নখটা কেটে বললো ‘মা জঁহুরাকে প্রনাম করেছিস!’।সবকিছু সেরে বেরিয়ে এলাম বাইরে... ।যথারীতি...ওরে গুরু গুরু... কি লাগছে কি লাগছে!!! আজ সপ্তমী।

ছেলেটাকে আমার মনে পড়ে পূজোর দিনগুলো এলেই।এই তো গেলোবারে সপ্তমীর দুপুরে লিডিয়া ভেসে উঠলো - কি করছো?

- কি আর করবো? অফিস! চেন্নাই অফিসে ছুটি নেই ।

- সপ্তমীতে অফিস! তুমি তো যাতা...আরে আমি তো ল্যাবে যাইনি আজ।প্রফেসরের বুড়ো মুখটা আজ ভাল্লাগছেনা।রিসার্চ মাথায় থাক।আজ সপ্তমী দাদা।ভুলে গেলে চলে?

- সন্ধ্যেয় যাবি? তোর সাথে দেখাও হয়ে যাবে! একবছরের সম্পর্ক ...এখনো তো দেখাই হলো না !অথচ এক শহরেই থাকি!

- চলো আজ দেখা করা যাক।কোথায় আস?

- ঠিক হ্যায়, তুই টি নগরের বাঙ্গালী অ্যাসোসিয়েশনের পূজোতে চলে আয়। ওখানে ফোন করিস।দেখা হয়ে যাবে।সপ্তমীতে ওদের কিছু প্রোগ্রামও আছে, প্রকল্পদা বলছিলো।

-ওক্কে ...আমি তবে সাজুগুজু করে নি...

এক দঙ্গল ছেলে সাত নম্বর রাস্তা ছেড়ে এগোচ্ছে রিক্রিয়েশন সেন্টারের মাঠের দিকে।একটা বড় কমিউনিটি পূজো।ফরাক্কার সবচেয়ে বড় পূজো এটাই।সারা মাঠ জুড়ে মেলা বসেছে গোল হয়ে সীমানা বরাবর।বন্দুক দিয়ে বেলুন তাক করা,নাগরদোলা,বই এর ষ্টল থেকে মোগলাই পরোটা, চপ-সিঙ্গাড়া, ঢাকাই পরোটা...।কি নেই!মাইকের চোঙে বাজে কুমার শানুর গান...।আর মাঝে মাঝে গান থামায় শানুদা, প্যান্ডেলের ভেতরে ঢাকিদের রিদম্ শোনার জন্য...

সাথে পিচকে ছেলেটা দঁত বের করে হেসে ওঠে কাঁসরে তাল দিতে দিতে।আমরা প্যান্ডেলের ভেতরে দাঁড়াই... ।আমাদের প্রানের পূজো।সারা বছরের আনন্দ গুলো জমা করে রেখেছি লক্ষীর গোপন ভাঁড়ে...আজ ভাঙ্গবো সেই ভাঁড়।মা দূর্গার তেল চকচকে মুখে টিউবলাইটের ঠিকরে পড়া আলোয় পিছলে যেতে যেতে... শুনতে পেলাম কে যেন ডাকছে...

- তুমিই অতনুদা তো!

পেছনে তাকিয়ে দেখি ছবিতে দেখা মেয়েটি...লিডিয়া... ।চেন্নাই এ দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে ভালোবেসে ফেলেছে শহরটাকে।বায়োলজির রিসার্চে থাকতে থাকতে ওর মনেও একটা উদার জগত।ধর্মের প্রাচীর গুলো ও কোনোদিনই খুব একটা 'জরুরী' মনে করেনি!তাই ঈদ আর দূর্গোপূজো ওর কাছে শুধু 'বিনদাস আড্ডা' ছাড়া আর কিছু নই।কি সুন্দর লাগছে ওকে শাড়ীতে।রঙটা একটু চাপা হলেও মুখটা বড় মিষ্টি।সারা বছর ধরে অনেক কথা বলেছি ওর সাথে।খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে আমার লেখাগুলো...যেখানে যা ছাপে।আর ওর গান শুনে আমি আমার মন টিউন করি মাঝে মাঝেই... রবিঠাকুরের সুরেলা কবিতাগুলো ওর গলায় প্রান পায় ওর কাছে...আর আমার কাছেও!

- তাহলে অবশেষে!

- চলো ওপর নীচে দেখে আসি...কোথায় কি হচ্ছে...

- চল্...

অষ্টমীর সন্ধ্যেয় সারা মাঠ জুড়ে আড্ডা ।পাড়াতুতো আড্ডা, ক্লাসতুতো আড্ডা, রাজনীতি তুতো আড্ডা...মহিলা মহল...হৈ হৈ... ।চপ আসছে ঠোঙায় ঠোঙায় ।আসছে প্লাস্টিক কাপে চা-ও।ছেলেটা নিজের ক্লাসের ঠেকে বসলেও চোখ আছে মা-দের ঠেকে।মা-দের ঠেকে সাদা ফুটফুটে গাউন পড়ে বসে আছে 'মোম'।কি সুন্দর লাগছে ওকে।মাঝে মাঝে উঠে চলে যাচ্ছে মা-দের ঠেকে।আড়চোখে দেখে নিচ্ছে মোম-কে।ও তাকাচ্ছে কি! বুঝতে পারছেনা ছেলেটা।

হঠাত মোমের মুখটা বদলে যাচ্ছে ... লম্বা লম্বা চুলগুলো ছোট হয়ে বয়-কাট হয়ে যাচ্ছে ...আর সিগারেট খেতে খেতে ক্লাস ইলেভেনের ছেলেটা দেখছে নীলাঞ্জনাকে!ছেলেটা বহরমপুরে থাকে এখন...পুজোয় ফরাক্কা এসেছে।আর নীলাঞ্জনাও।মেয়েটা যে ওর সেই ক্লাস সিক্স থেকে মনের ভেতর পুষে রাখা আনচানানি...না এবার বলে ফেলতেই হবে।ছেলেটা সিগারেটের শেষ টানটা দিতে দিতে সেদিন জানতেও পারেনি...জীবন এতো সহজ বিজ্ঞান নয়...জীবন নীলাঞ্জনাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবে একদিন...যদিও ভুলবেনা ও কোনোদিন!

স্টেজে গান হচ্ছে ... ।সারে গা মা পা-য়ের টিমকে একটু আগে ও আর প্রকল্পদা হোটেল থেকে নিয়ে এসেছে বাসে করে।জমিয়ে দিয়েছে ওরা।সারা হল নাচছে।আজা আজা দিল্লী ছোড়ে...থেকে মাসাকলি মাসাকলি... ।তুঝসে নারাজ নেহী থেকে এই পথ যদি না শেষ হয়!হাততালিতে ফেটে পড়ছে হল।পায়ে ব্যাথা নিয়ে নেচে নিলাম কয়েক পাক সামনে গিয়ে।একটু পরেই আমাদের খুব ক্ষিদে পাবে..আর চেন্নাই এ বসে পাত পেড়ে বাঙালী ভোজ খাবার আনন্দটাকে যে কি...সেটা প্রবাসী পূজোর সাথে যারা ইনভলভ তারা সক্কলে জানে!

নবমীর দুপুরে পাড়ায় প্রবল ব্যস্ততা।একটু আগেই জজ কোর্টের মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়ে গেছে দুমদাম।রিটায়ার মেন্টের পরে বহরমপুরে এসে ছেলেটার বাবা তো নতুন উদ্যমে সেকেন্ড ইনিংস শুরু করেছেন মনে হয়!পাড়ার পুজোর সেক্রেটারী, ছেলেদের নিয়ে চাঁদা তোলা, মিটিং ,পুজো ব্যবস্থাপনা...কত্তো কাজ

ভদ্রলোকের।দুপুরে হবে প্রতিযোগীতা...হাঁড়ি ফাটানো।চোখে কালো রুমাল বেঁধে একবার-দেখানো-হাঁড়িটাকে তাক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাটের মাঝে লাঠি দিয়ে হাঁড়ি ভাঙ্গা!ছেলেটাও নাম দিলো।চোখের অঙ্কে মেপে নিলো পথটা...এবারে বন্ধ চোখে এগোচ্ছে হাঁড়ির দিকে।মনে পড়ছে ঠাম্মার কথা।সারা জীবন মানুষটা প্রায় অন্ধ।তাও বাঁচতে কসুর নয়!এভাবেও বেঁচে থাকা যায়!ছেলেটা এগোচ্ছে এক পা এক পা করে...।মন বলছে এবার লাঠি চালাবার সময়... ইইইইইইয়া...।ফটাস...।চারদিকে হুল্লোড়।ক্লাব সেক্রেটারীর ছেলে প্রথম ফাটালো তবে!চোখের বাঁধন খুলে নতুন করে দেখল পৃথিবীটাকে...ঠাম্মা তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো...তাও এভাবেও বেঁচে থাকতে পারা যায়!সেটা জানল ছেলেটা...

দশমীর সারা দিন...একটা বুক চাপা কষ্ট।ঈশশ আবার স্কুল খুলবে...এই এত্তো আলো চলে যাবে।ঠাকুর বিসর্জন হয়ে যাবে রাতে।ক্লাস এইটের ছেলেটার এই দুঃখটা ক্লাস টুয়েলভ এর ছেলেটাও পায়, পায়ের ওপর পা তুলে ভরদুপুরে পূজাসংখ্যা দেশ পড়তে পড়তে।একটু পরে ছেলেটার মা আসবে সিঁদুর খেলে...সিঁদুরগুলো ধেবড়ে লেপ্টে থাকবে মায়ের সারা মুখে...আর ঠোঁটে থাকবে গর্বের হাসি।

প্রকল্পদা ফোন করে... সন্ধ্যেবেলায় সমুদ্রের ধারে চলে এসো...আমরা ঠাকুর নিয়ে পৌঁছে যাবো।আমি আর তোতন একটু দেরীই করে ফেললাম।সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা।নিঃঝুম বিচ।পুলিশওয়ালারা ফিরছে ... ক্লান্ত পায়ে।সব বিসর্জন শেষ!আমি আর তোতন গিয়ে বসি সমুদ্রের বালির ওপরে।চেন্নাই এর সোঁদালো হাওয়া আমাকে নিয়ে যায় বহরমপুরের উকিল পাড়ার জোড়ামন্দিরে।একটু পরেই ঠাকুর বেরোবে বিসর্জনে।ট্রাকে তোলা হচ্ছে প্রতিমা।ঠাকুর থাকবে কতক্ষন...ঠাকুর যাবে বিসর্জন... বেজে চলেছে ঢাকের বোলে।সমস্ত পাড়া থেকে নদীর স্রোতের মতো বিসর্জনের মিছিল বেরিয়েছে গঙ্গায় মেশার আগে।ছেলেটার বাবা মিছিলের একেবারে আগে দাঁড়িয়ে।গঙ্গার ধারে হ্যালোজেনের আলোয় ...সে কি নাচ।পাড়ার দত্তকাকু নাচছে... বাচ্চুদা নাচছে...নাচতে নাচতে গড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়।ছেলেটাও নাচছে...ওর বাবাও এসে দুবার নেচে নিলো।সারা গঙ্গার পাড় লোকে লোকারন্য।ঢাকে ঢাকারন্য! ছেলেটা খুব হাঁফিয়ে যায় নাচতে নাচতে ।বাবাকে আড়াল করে সিগারেট ধরায়... সামনে মিতা দাঁড়িয়ে আছে না!মেয়েকে কোলে নিয়ে!ওর একসময়ের ভালোলাগা!বিসর্জন হয়ে গেছে সেই কবেই!সিগারেটের ধোঁয়াটায় একবার কেশে উঠলো ছেলেটা !

মনে পড়লো কেশে ওঠার দিনগুলো। বিসর্জনের প্রসেশনে ফরাক্কার রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে বিশাল একটা মিছিল।সুখবিন্দর , দালের পাজী পা দুটোকে থামতে দিচ্ছেনা!নীলাঞ্জনাদের কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যাবার সময় ছেলেটা একটু বেশীই নাচছে...।ও দেখছে কি!গঙ্গার ধারে বড় বড় বোল্ডার বসানো...।ওরা নেমে যাচ্ছে বোল্ডার ধরে।ঠাকুর থাকবে কতক্ষন ...ঠাকুর যাবে বিসর্জন।মিলনদা পাগলামো শুরু করেছে।জল ছেটাচ্ছে নদীতে নেমে।ছেলেগুলো দৌড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।দাঁত বের করে খ্যাকঁ খ্যাঁক করে হাসছে মিলনদা... ওরে আয় ... ঠাকুর ধর আগে!

সিগারেটের টানটা শেষ হবার আগেই ছেলেটা দেখছে ঠাকুর নেমে যাচ্ছে গঙ্গায়...ছেলেটা দৌড়ে বাবার পাশে চলে এলো।পটা পট ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠছে ।আসছে বছর আবার হবে।বলো দূর্গা মাই কি...জয়।আমার চোখ মিতার দিকে কেন চলে যাচ্ছে! ওর মাথায় বিক্রি হয়ে যাবার চিহ্ন তাও!ঠাকুর ঘুরছে গঙ্গার জলে...আমিও মিতার সাথে ঘুরতে পারতাম...নীলাঞ্জনার সাথেও!জীবনের দাবী মেনে নেয়নি!ঠাকুর ডুবছে জলে...ছেলে মেয়ে বাহন ...সবকিছু নিয়ে। ফরাক্কার ছেলেটা কোনোমতে একটা খাঁড়া জোগাড় করেছে ঠাকুরের হাত

থেকে।ও নদীতে নামবেনা।সাঁতার জানে না।ঝপাং করে লাফিয়ে পড়লো অনেকে জলে।চান করে নেবে... বিজয়া দশমীর স্নান।

বহরমপুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ভেবে চলেছে ...কাল থেকে প্রনামের পালা চলবে...চলবে নাড়ু,নিমকির পালাও।আর রেশ মিলিয়ে যাবে কিছুদিন পরেই।পাড়ার সবাই ফেরার পথ ধরলো এবার...দুর্গোমন্দিরে ফিরে একটু মিষ্টি মুখ আর কোলাকুলি।ফরাক্কার ছেলেটাও ফিরছে বাড়ী...অনেক রাত হয়ে গেছে...মা ভাবছে বোধ হয়।

আমি আর তোতন ফিরে আসছি সমুদ্রের ধার থেকে হাঁটতে।চেন্নাই এর এই জায়গাটা বড় সুন্দর।তোতন বললো।তা বটে।নিঃস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসা দুটো একলা মানুষের...একলা গুহায় ফিরে আসার পালা আবার।ছেলেটার স্কুল খুলে যাবে আবার।মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে ,জয়েন্ট আছে...কত চাপ।আমার অফিস তো খোলাই...।সারা চোখে মুখে পূজো।আমার সাথে সেই ছেলেবেলার ছেলেটার আনন্দ...পূজোর আনন্দে মিশে আমায় ঠিক এই মুহুর্তে আনচান করে তুলছে সামনে মঙ্গলবার সকাল দশটা পনেরোর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের জন্য।একদিকে গুরগাঁওয়ের প্রিয় মানুষদের ছেড়ে যাবার চিনচিনে ব্যথা...আর অন্যদিকে...আমার কাছের মানুষেরা।কোলকাতা ছুঁয়ে যাবো বহরমপুর।দেখা হবে আমার বাবা, মা স্ত্রী, কন্যে,আর সেই ছেলেটার সাথে।সবাই মিলে একসাথে কাটাবো এবারের দুর্গাপূজো...। সকলকে জানাই দূর্গোপূজোর আগাম শুভেচ্ছা।ভালো থাকবেন।

পূজোর স্মৃতি

স্বপ্ননীল

আকাশবন্ধু,

নীলাম্বরী শাড়ি পড়ে সাদা মেঘের আঁচল উড়িয়ে যখন শরৎ আসে জানি না কোন মায়াবী জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় বন শিউলি ফুটে ওঠে। জলে ভাসে শাপলা, পদ্ম। ধূ ধূ করা মাঠে সাদা কাশের বনে হেমন্তের বাতাস যে মায়ের আগমনী বার্তা বয়ে আনে সেই মাকেই যে দেখতে পাই ঘুম থেকে উঠে আমার জানালার পাশের মাধবীলতা গাছের একটি পাতায় এক বিন্দু শিশিরে। আর ভোরের সাত রঙ যখন আসে সেই বিন্দুতে পড়ে সাতনরি হার হয়ে যায়। ঠিক তখনই ছুটে যাই ঘরে ক্যামেরাটা আনার জন্য...ছবিটা তুলে তোমায় পাঠাবো বলে। কিন্তু ক্লিক করার আগেই একটা দুষ্টু নাম না জানা হলুদ পাখি এসে বসে সেই মাধবীলতার ডালে। আর তখনই শিশিরের সাতনরী হারটা টুপ করে পড়ে যায় জানালার নীচে আপনা থেকেই গজিয়ে ওঠা একটা লাল-হলুদ ছিটে দেওয়া বুনো কচু গাছের উপর।

আকাশবন্ধু, কিছু ছবি বোধহয় শুধুই মন-ক্যামেরার জন্য, তাই না? কেন একথা লিখলাম এবারে সে কথাই বলি। পাড়ি দিয়েছিলাম এই জনসমুদ্র থেকে অনেক দূরে। নদীয়া জেলার এক প্রত্যন্ত্ গ্রামে। এক বন্ধুর মাসির বাড়ি, গ্রামের পূজো দেখবো বলে। যে গ্রামে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৭টি বাড়িতে টিভি চলে। খুব কম বাড়িতেই বিদ্যুৎ আছে। মোবাইলের নাম তো শুনেছে, টিভিতেও দেখে কিন্তু আজো সেখানে কোন টাওয়ার পৌঁছয় নি। সারা গ্রামে একটিই পূজো হয়। আমি যখন প্রথম দেখলাম গ্রামটিকে মনে হয়েছিল কোনও ক্যালেন্ডারে দেখা গ্রামে এসে পড়েছি বা ছোটবেলায় ড্রইং খাতায় আঁকা কোনও গ্রামে। গোবর দিয়ে নিকোনো খড়ের চাল দেওয়া চন্ডিমন্ডপে কিশোরী হাতে আঁকা চালগুঁড়ির আলপনা দেওয়া হয়...একই প্রথামতে প্রতিবার কুমোর এসে মাতৃপ্রতিমা গড়েন। সেই কদিন পাড়ার কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চন্ডিমন্ডপের একপাশে ভোগের জন্য আটচালা। সেখানে পাড়ার বৌ-রাই ভোগ রান্না করেন প্রতিদিন, খিচুড়ি, বেগুনি, লাবড়া। যার যার ক্ষেতের চাল ডাল সবজি সব দিয়ে তৈরী হয় ভোগ। মায়ের ভোগের পর আরতি হয়। তারপর পংক্তি ভোজন। প্রথমে বাচ্চারা, তারপর ছেলেরা, তারপর মেয়েরা। গ্রামের সবাই একসঙ্গে সেই গোবর নিকোনো উঠোনে বসে লাইন করে। সবুজ কলাপাতা আর মাটির ভাঁড়ে জল। গ্রামের বৌ-রা কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে শুরু করেন পরিবেশন। সে যে কি আনন্দ বন্ধু! সারা রাত ধরে কোলকাতায় গাড়ি আর মেট্রো চড়ে, এগরোল আর ফুচকা খেয়ে কোনদিনও বুঝতে পারতাম না যদি না আসতাম এই গ্রামে। গ্রামের মা-কাকিমাদের নিজের হাতে তৈরী করা মাটির প্রদীপে ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে যখন শুরু হল সন্ধিপূজো পুরোহিত দাদুর মন্ত্রোচ্চারণে, ভক্তি-নিষ্ঠায় সেই আড়ম্বরহীন, প্যান্ডেলহীন, চন্দননগরের ঝলমলে লাইটিংহীন এক প্রত্যন্ত্ গ্রামের মানুষগুলোর মুখ দেখে মনে হয়েছিল বাঁশ বাগানের ফাঁক দিয়ে ঐ বুঝি অষ্টমীর বাঁকা চাঁদ নেমে এল মাটির পৃথিবীতে! কখনও অনাবৃষ্টি, কখনও অতিবৃষ্টিতে, দারিদ্রতায়, কষ্টে থাকা মানুষগুলোর নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবনে একমাত্র আনন্দের ঢেউ এনে দেয় আমাদের মা উমা।

আকাশবন্ধু, অনেক তার্কিকেরা, যুক্তিবাদীরা ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে তর্ক করেন, কিন্তু সেইসব তর্ক থেকে অনেক দূরে থাকা এই গ্রামটা দেখে আমার মনে হল, ঈশ্বর-ভগবান যা-ই বলা হোক না কেন, এই ধারণার বড় প্রয়োজন এইসব নিভে যাওয়া গ্রামগুলোতে। হাজার কষ্টের মধ্যেও যাঁরা ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

তারপর যখন চোখের জলে দশমী এল। সিঁদুরখেলা বন্ধু কোলকাতাতে আমরাও দেখি কিন্তু সেদিন যা দেখলাম তার কোনও তুলনা হয় না। ইচ্ছে করেই ছবি তুলিনি শুধু সে ছবি মন-ক্যামেরাই বন্দি করে রাখবো বলেই! ১০৮জন মহিলা বরণের নানা উপকরণ নিয়ে লাল পাড় শাড়ি পড়ে মাকে ৭বার প্রদক্ষিণ করে ঠিক যে ভাবে মেয়ের বিয়ের পর মা বিদায় দেন তাকে চোখের জলে, সেইভাবে চোখের জলে মায়ের নিরঞ্জন হয়ে গেল। নবমীর রাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল নারকোল কোরার কাজ, সঙ্গে কুচো নিমকি। বিজয়াও যে এতো আনন্দের হয় আমরা ভুলতেই বসেছি...এস এম এস-এ শুভবিজয়া সারা আজকের তথাকথিত আধুনিক মানুষেরা।

একা দশমীর দিন যখন ফিরে আসছি। দুপাশে সারি দেওয়া সুপুরি গাছের সারি, তালদিঘি, পোস্ট অফিস আর সেই চন্ডিমন্ডপকে পিছনে ফেলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটছি হঠাৎ বন্ধুর মাসতুতো ছোট বোন ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে দিয়ে গেল ছোট একটা পুঁটুলি। বলল - মা দিল, অনেকটা পথ বাসে যাবে, রাস্তায় ক্ষিধে পাবে, খেও নাড়ু আর নিমকি আছে। বলে প্রণাম করে ও চলে গেল ওর পোষা হাঁসগুলোকে খুঁজতে পাশের দিঘিতে। সেদিন কেন জানি না এক অজানা কারণে চোখটা জলে ভরে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পর বাস এল। উঠে জানালার পাশে বসে দেখলাম ওর বোন যাকে আদর করে সবাই ছুটকি বলে ডাকে, সে ওই দিঘিটার কাঁঠাল গাছের শ্যাঁওলা ধরা গুঁড়িতে তৈরী ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকছে তার পোষা হাঁসগুলোকে-আয় আয় আয়-তু তু তু, চু চু চু-আয় আয় আয়, তু তু তু-আয় আয় আয়-

অনুভবের তো কোন ভাষা হয় না বন্ধু, সে তো শুধু এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে বয়ে যাওয়া আর বয়েই যাওয়া। তাই আমার জানালার পাশে মাধবীলতাটাই বসা সেই হলুদ পাখিটার ঠোঁটে করে আমার অনুভবটুকু পাঠিয়ে দিলাম তোমাকে। তুমি তাকে পাঠিয়ে দিও তোমার বন্ধুদের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

শুভ বিজয়া,

ইতি তোমার

স্বপ্ননীল

দুগগাপুজোর দিনগুলো

অভ্র

কফিহাউসের আড্ডায় এক এক করে সবার স্মৃতিকথা পড়ছি। পড়ছি আর পড়তে পড়তে ভেসে যাচ্ছি। একাত্ম হয়ে যাচ্ছি লেখক লেখিকার কত ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে। অদ্ভুত লাগছিল ইন্দিরাদি, মেঘদি, রাজাদা, নিতা, সুতপাদি, স্বপ্ননীল – সকলের কথা পড়তে। খুব সহজেই জড়িয়ে পড়ছিলাম অপরিচিত সব স্মৃতির সঙ্গে। স্মৃতি তো শুধু কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তার সঙ্গে সকলের খুব আন্তরিক কোন একটি অনুভূতি জড়িয়ে আছে। পড়তে পড়তে সেইসব স্মৃতির রঙ যেন মেখে নিচ্ছিলাম নিজের অজান্তেই। একটা সময় খেয়াল করলাম আমার নিজের উৎসবের স্মৃতি কোথায় গেল? তারা এসে ভিড় করছে না কেন? কফিহাউসের পক্ষ থেকে ইবুকের উদ্যোগে আমি অনেককেই অনুরোধ করেছি লেখা দেওয়ার জন্য। অথচ সেই জায়গায় এসে আমার নিজের কলম কেমন থেমে যাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম না। এখন যে এমনিতে আমার কোন রাইটার্স ব্লক চলছে এমনও না। দিব্যি লিখে চলেছি টুকটাক।

দুদিন আগে মার সাথে ফোনে কথা বলছি। এমন সময় মা বলল, ‘আমাদের যাদবপুরের হাউসিং কমপ্লেক্সে কি সুন্দর পূজো হত আর এখানে হয় না। এই নতুন পাড়ায় আমরা কাউকে তেমন জানি না’
আমি চমকে গিয়ে বললাম, ‘যাদবপুরে কমপ্লেক্সে পূজো হত বুঝি?
মা বলল, ‘সে কি রে, তোর মনে নেই?’
আমি বললাম, ‘কই না তো’
মা বলল, ‘আরে যেখানে পূজোর পত্রিকাতে তুই কিছু একটা লিখলিও। যেবারে তুই পূজোর দুদিন আগে ফিরলি বেলফাস্ট থেকে। সপ্তমীর দিন প্রচন্ড বৃষ্টি হল। সব ভুলে গেলি?’
আমার সত্যিই মনে পড়ছিল না। রেগে মেগে বললাম, ‘যা আমার কাজে লাগে না, সে সব আমি মনে রাখি না’

মাও অভিমানে আর কিছু বলল না। পরে ভাবছিলাম আমাদের পেশায় মানে এই সফটওয়্যারের দুনিয়ায় এমনিতেই একধরনের কাজ করতে করতে একটা অবসাদ খুব দ্রুত এগিয়ে আসে – সেরকম কিছু হচ্ছে না তো? স্মৃতি একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে না তো? খুব ভয় ভয় করল একটা ভেতর ভেতর। সেকথা কাউকেই বললাম না। মাকেও না, বৌকেও না।

দুদিন আগে ছিল আমার উনত্রিশতম জন্মদিন। একদিন আগে থেকে খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে দিনটা বাড়ির বাইরে কেমন একা একা কাটাতে হচ্ছে। সেদিন সকালে উঠে আমার মনে পড়ল – আরে জন্মদিনটা বাইরে আছি তো কি হয়েছে, অষ্টমীতে তো আমি কলকাতায়। ঐদিনই পালন করা যাবে বাড়ির সকলের সাথে। আসলে আমার দুর্গাপূজোর অষ্টমী হচ্ছে আমার জন্মতিথি। ছোটবেলায় এই বলে আমাকে খুব খেপান হত – তোর জন্ম মা দুর্গার অংশে নয়, অসুরের অংশে। আর খুব চট করে রেগে যেতাম আমি। এইসব মনে পড়তে নিজের অজান্তেই খিক খিক করে খানিক হাসলাম। যে একপা পিছনে বাড়াতে পেরেছি তখনও ঠাহর হয়নি। তারপর গোটা দিনটায় হুড়মুড়িয়ে মনে পড়তে শুরু করল সব। জানি না এতদিন তাদের কে ধরে রেখেছিল। তবে এবারে আর তারা বাধ মানল না। হয়তো জন্মদিন বলে, হয়তো ফেরার দিন এগিয়ে আসছে বলে। কি করে জানি না, তবে তারা সব হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল। বেছে নিয়ে সেরকম কিছু কথাই বলব ঠিক করেছি আজ।

আমার ছেলেবেলার গোটাটাই কেটেছে শ্যামনগরে। আর আমার পূজো বলতে আমাদের বাড়ির দুপা সামনে বাসুদেবপুর সার্বজনীন দূর্গোৎসব। মফঃস্বলে পাড়ার পূজোর গুরুত্বটা কেমন সেটা বোধহয় যাঁরা কলকাতার বাইরে সেরকম পূজোয় জড়িয়ে পড়েননি তাঁদেরকে বলে বোঝান একটু মুশকিল। পূজোর কটাদিন পাড়ার সকলেই একটা পরিবারের মত। সবার মুখে একই কথা। এই পূজোর কমিটিতে আমার জেঠু, কাকা, দাদা সবাই খুব ওতোঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অনেক বছর ধরেই। আজকাল আমাদের ঠাকুর আসে কুমোরটুলি থেকে। তবে আমাদের ছোটবেলায় তা শ্যামনগরেই তৈরী হত। যেহেতু বড়োজেঠু প্রতিমার দায়িত্তে থাকতেন, তাই উনি আমাকে মাঝে মাঝেই পূজোর আগে প্রতিমা কেমন করে তৈরী হচ্ছে দেখাতে নিয়ে যেতেন। এই পূজোই আমার কাছে সবটুকু ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে অনেক বছর ধরে বিভিন্ন কারনে আমি ঐ পূজো থেকে দূরে থাকলেও মনে মনে আমি যে কোন সময় আমাদের পাড়ার মন্ডপে যেন পৌঁছে যেতে পারি।

আমি কোনকালেই খুব একটা ডানপিটে বা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, স্মার্ট টাইপের ছিলুম না বরং বলা যেতে পারে একটু হুঁশো টাইপ। বড়মামা আমাকে অনেকবার ঐ নামেই ডাকতো। কারনটা একটু ভেঙে বলি। পূজোর আগে বন্ধুরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করত – কিরে পূজোয় কটা জামাপ্যান্ট হল? আমি বলতাম – কি জানি। ঠিক খেয়াল নেই। হয়তো বেশ কয়েকটাই পেয়েছি। তবে মনে নেই। এইরকম। তবে অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রতিবারে একটা পাজামা-পাঞ্জাবী আসতই। ফোনে খবর পেয়েছি এবারেও এসেছে। যাইহোক, ছোটবেলায় পূজোর পাওনাগন্ডার ব্যাপারে আমি একটু হুঁশোই ছিলাম। কখনও সখনও এক আধটা জিনিসের জন্য যে বায়না করতাম না তা নয়। তবে ঐ সবই আনকা গোছের। আজকালকার মফঃস্বলের বাচ্ছাদের দলে কল্কে পেতাম কিনা সন্দেহ।

আমি একটা বছরের কথা একটু বলি। বলার বিশেষ কারন আছে। তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। মানে ৯২ সাল। আমাদের বাড়িতে বলা হল যে পূজোয় আর ক্যাপ ফাটান যাবে না। আমাদের বলতে আমি আর আমার মামাতো ভাই বুল্টা। আমরা দুজন ছিলাম মানিকজোড় – চিন্টু আর বুল্টু। এরও বছর খানেক আগে বড়মামারা নৈহাটির পাট তুলে শ্যামনগরে চলে এসেছেন। ফলে আগে যে মানিকজোড়ের দেখা হত বড়দের মেজাজ মর্জির ওপর নির্ভর করে, পরে সেই বাধাধরা আর রইল না। হইহইয়ের মাত্রাতা একটু বেড়েই গেল। যাইহোক, ততদিন পর্যন্ত পূজো মানে ছিল ক্যাপ ফাটান। শুধু বন্দুক দিয়ে নয়, আর কি কি পদ্ধতিতে ক্যাপ ফাটান যায় – যেমন হাতুড়ি, চটি, আতশকাঁচ এইসব নিয়ে প্রামান্য গবেষনা করে পূজোর দিনগুলো কাটতো। এহেন অবস্থায় ক্যাপের রেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব মুষড়ে পড়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। অথচ আমাদের পাড়ার দুই বন্ধু –শাক্য আর মান্টি সেবছরেও ক্যাপ ফাটানোর ছাড়পত্র পেয়েছে। ফলে আমাদের দূর্দশার অন্ত ছিল না। সন্ধে হলে দুই ফচকে আমাদের বাড়ির সামনে এক রোল ক্যাপ ফাটিয়ে শক্তিপরীক্ষা করত। কি আফশোসটাই না হত সেইসব দেখে।

তো এর পরে কি আর করা যায়। আমরা ঠিক করলাম, প্যান্ডেলে বসে না থেকে বরং অন্যান্য পাড়ার ঠাকুর দেখে আসি। তখন আমাদের একা একা রেললাইন পেরিয়ে অন্যদিকে যাওয়াই বারন ছিল। কিন্তু বাড়ি থেকেই যখন বলা হয়েছে যে তোমরা বড় হয়ে গেছ, আর ক্যাপ ফাটাতে পারবে না; তাই আমরা সেই অলিখিত নিয়মের তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে পড়লাম। মফঃস্বলের পূজোয় পাড়ায় পাড়ায় কিরকম রেশারেশি চলে তার একটা নমুনাও পেয়েছিলাম সেবার। সাহেববাগানে আমাদেরই এক বন্ধুদের পাড়ায় গেছি। তারা আমাদের দেখে কি একটা ছুঁড়ে মারতে শুরু করল। ঠিক আমাদের লক্ষ করে নয়, আমাদের পায়ের দিকে আর সেগুলো দুমদাম শব্দে ফাটতে শুরু করল। ঐ সময়ে হাতে ধরে বোম ফাটানোর প্রতি আমার একটু ভয়ই ছিল বলতে গেলে। কাজেই আমরা চুপচাপ কেটে পড়লাম। পরে জানতে পারি ওগুলোকে বলে আলুবোম। আগুন ধরাতে হয়

না। তবে সপাটে ছুঁড়ে মারতে পারলেই ফাটে। মাঝে কয়েক বছর ঐ জিনিসটা খুব চালু ছিল। পরে শুনেছি পেটো বোমার মিনি সংস্করন হিসেবে আলুবোম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যাইহোক, ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা সময় বুঝলাম ঘোর বিপাকে পড়েছি। রাস্তা চেনা যাচ্ছে না। আর বাড়িতে বলেও আসা হয়নি। একটু ভয় ভয় করছে। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম যে দিকে যাচ্ছি সেদিকেই চলতে থাকি। তখন ছোট তো, তাই অনেক কম রাস্তাও বড় মনে হচ্ছে। পরে মাপ করে দেখেছি ঐটুকু তেমন কিছুই না। শেষমেষ আমরা এসে পড়লাম ইস্কুল বাস যাওয়ার পরিচিত রাস্তায়। ঐ বড়রাস্তায় হাঁটাও আমাদের নিষেধ ছিল। কারন ও তো আর পাড়ার রাস্তা নয় –ওখানে বাস, লরি কত কিই না চলে। কিন্তু আনন্দে ডগমগ হয়ে আমরা সেই রাস্তা ধরেই বাড়ি ফিরলাম ঘন্টা দুই তিন পর।

বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে বললাম সব কথা। মা সামনে থাকলে মার খাওয়া হয়তো কেউ ঠেকাতে পারতো না। তবে বাড়ির সবাই গল্প করছিল বারান্দায় বসে। কেউ দেখলাম বকাবকির ধার দিয়েও গেল না। এই বোধহয় পূজোর মেজাজ। শুধু বড় জেঠু জিজ্ঞেস করলেন – 'কোন ঠাকুরটা সবচেয়ে ভালো লাগল?' আমি বললাম – 'অনেক প্যান্ডেল হয়তো আমাদের চেয়ে ভালো। কেউ অনেক আলো দিয়েছে। তবে আমাদের পাড়ার ঠাকুরের মত মায়ের মুখ আর কোথাও হয়নি'
জেঠু খুব খুশি। সেই কথা ফলাও করে সব্বাইকে বললেন। আরো অনেকেই আমার পিঠ চাপড়ে দিল। তবে আমি যা বলেছিলাম তা আমার সত্যি সত্যিই মনে হয়েছিল। একটু আগে বলছিলাম না, যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের পাড়ার পূজোমন্ডপে আমি যে কোন সময় পৌঁছে যেতে পারি? তা বোধহয় অনেকটা এইজন্যেও। আমাদের পাড়ার প্রতিমার মুখে এক অদ্ভূত জ্যোতি খুঁজে পাই।

তারপর থেকে আমরা যেকটা পূজো শ্যামনগরে কাটিয়েছি – সবসময়েই এই হারিয়ে যাওয়া রাস্তা দিয়ে একচক্কর হেঁটে আসি। পূজোয় টুকটাক বাইরে খাওয়ার কথা আর বললাম না। স্বাস্থ্য সচেতনতা ঐ কটা দিন শিকেয় তোলা থাকতো। আর এমনিই পথচলতি (থুড়ি উড়তি) কত শ্যামাপোকাই না পূজোর সময় পেটে গেছে। কটা ফুচকা, ঘুগনি, এগরোলে আর কিই বা বাড়াবাড়ি হবে? হয়ও নি। তখন ইমিউনিটিটাই ছিল অন্য লেভেলের। বাড়িতেও সেই কটা দিন হইচই, খাওয়া দাওয়া ভালোই চলত। বাইরে পেটপুরে খেয়ে আসছি বলে যে বাড়িতে খাচ্ছি না এমনটা হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

বিসর্জনের কথাটা না বললে পূজোর স্মৃতিটা ঠিক পুরোপুরি বলা হয় না। আমাদের নিয়ে বাবা প্রত্যেকবার আমাদের পাড়ার দলবলের সঙ্গে যেতেন। পাড়ার কয়েকজন ভ্যানের সামনে প্রচন্ডই নাচানাচি করতে করতে এগোত। অনেক পরে বুঝেছি নাচে ওদের সকলের উৎসাহের মধ্যে ভাঙ একটা খুব জরুরি ভূমিকা পালন করে এসেছে। সেবারে দেখি একটা কেউ সাদা শাড়ি পরে ঐ নাচন কোঁদনের সঙ্গে চলেছে। খানিক ঠাহর করতে দেখি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে যেন দাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি আর বুল্টা গবেষনা করে বের করে ফেললাম, এ আমাদের পাড়া দুধওয়ালা না হয়েই যায় না। তা আমাদের আন্দাজ ভুল হয়নি। সে বোধহয় সেবার কোন বাজিটাজি লড়েছিল। যাইহোক, এই তথাকথিত শোভাযাত্রা নিয়েও পাশাপাশি ক্লাবের ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে। এখনও লাগে। একটা সময় আমার খুব ইচ্ছে করত আমিও একটু ওদের সাথে একটু কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং নাচি। সে সাধটা আর পূরন হয়নি আজ অবধিও। তবে হ্যাঁ আরেকটা আশ মিটেছিল। প্রত্যেকবার ভাসানে পর মা দুর্গার অস্ত্রগুলো কেউ না কেউ নিয়েই আসত। ঐ বছর ঠাকুর নামাচ্ছিল দাদা। তাই মা দুর্গার ত্রিশূলটা আমি নিয়ে এসেছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়ির বাতাবী লেবুর গাছে সে ত্রিশূল বাঁধা ছিল।

পূজোর স্মৃতি এরকম আরো অনেক। তবে আমি একটা বিশেষ বছরের কথা বললাম। কারন ওই সময়টার কথা খুব করে মনে থেকে গেছে। পূজোয়

ফুরফুরে হাল্কা মেজাজে আনন্দ করাটাই ছিল প্রধান। কলকাতার ঠাকুর দেখতে যাওয়া, রাত জাগা এইসব কিছুর আকর্ষন আমার কোনদিনই ছিল না। আজ যে এই পূজোর আগে তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফেরা সেও ঐ নির্মল আনন্দের লোভেই। একটা কথা না বললেই নয়। তা হল এই যে আমার ভাই মনে হয় এই লেখা পড়লে খুব আপত্তি করবে। কারন তার কথা এই লেখায় একেবারেই আসে নি। আসবে কি করে? সে যে তখন এক বছরের শিশু। তাকে কোলে করে ঠাকুর দেখেছি বোধহয় আরো পরে। কিন্তু তখন তো আমি মনে মনে আরো বড় হয়ে গেছি। ছেলেবেলার উৎসবের স্মৃতির কথা লিখতে বলেছিলেন মাল্যবানদা। তাই ঠিক যে সময়টায় মনে ছোট না বড় এই দোলাচল, সেই সময়টার কথা লিখলাম। আর সেবছরই আমরা যে প্রথম ইস্কুলে মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র শিখেছিলাম। অর্গলা স্তোত্র শিখেছি অনেক আগেই। কিন্তু ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দিশো যহি’ সুরের চেয়ে ‘অয়ি গিরিনন্দিনী, নন্দিত মেদিনী, বিশ্ববিনোদিনী শৈলসুতে’ সুরটা আমার অপূর্ব লাগতো। এখনও লাগে।

সে দিনের ঈদ গুলি

নীল নক্ষত্র

ছোট্ট একটু আপডেটঃ

জীবনে যে কত দেশের কত শহরে ঈদ করেছি সে অনেকের কাছে বিস্ময় বলে মনে হবে। এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা বলি। ঈদের আগের দিন জাহাজ দুবাই এসেছে, গেটের বাইরে এসে দেখি কাছেই ঈদ গাহ। বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিলাম কাল তা হলে এখানে ঈদের নামাজ পড়ব। সকালে উঠে যথারিতী গোসল করে কাপড় চোপর পরে চলে এলাম মাঠে কিন্তু কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই, নেই, নেই। কি ব্যাপার? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মহসীন বলল চল গেটের সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করে দেখি কখন জামাত হবে। সিকিউরিটি বির দর্পে জানাল আরে তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ? জামাত তো ফজরের নামাজের পরেই হয়ে গেছে এখানে ঈদের নামাজ পড়তে চাইলে কোরবানির ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যাও যাও জাহাজে ফিরে যাও। সবাই মনে একটু দুঃখ নিয়ে জাহাজে ফিরে এসেছিলাম। এছাড়া করাচী, বাহরাইন, ইরান, অক্সফোর্ড, গ্লস্টার, বার্মিংহাম, লেস্টার, লন্ডন, কার্ডিফ, নিউক্যাসেল, চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা, ঢাকা অন্তত এই শহর গুলিতে ঈদ করেছি এবার প্রায় ১০ বছর পর আবার ঢাকায় ঈদ করব ইনশাল্লাহ ।

আমার ছেলেবেলার ঈদ নির্দিষ্ট কোন শহর বা এলাকায় কাটেনি। বাবা সরকারি চাকরি করতেন বলে তাকে বিভিন্ন সময় দেশে বিদেশের নানা যায়গায় থাকতে হয়েছে। এই সুবাদে মানিকগঞ্জের ঝিটকার পাশে আমাদের নিজ গ্রামে নিজ বংশের আত্মীয় স্বজনের সাথে এমনকি ধামরাইর পাশেই নানা বাড়িতেও কয়েক বার ঈদ করার সুযোগ পেয়েছি।

তখনকার ঈদ এবং আজকালের ঈদের মধ্যে কোথায় যেন একটু ভিন্নতা লক্ষ করি। তখন ছিল নিছক অনাবিল আনন্দের ঈদ আর আজকাল কেমন যেন পোশাকি একটা অনুষ্ঠানের মত মনে হয়। তখন আমরা যে আনন্দ পেয়েছি তা আজ কাল ছেলে মেয়েরা পায় কিনা বলতে পারব না। তবে এমনও হতে পারে যে আজকাল ঈদের বা অন্য যে কোন আনন্দের সঙ্গা ও বদলে গেছে। তখন আমার বাবা এমন কোন চাকরী করতেন না যে তিনি প্রতি ঈদেই নতুন জামা কাপড় দিতে পেরেছেন। পুরনো যা আছে দেখেছি মা তাই সুন্দর করে ধুয়ে কয়লার ইস্ত্রি দিয়ে ইস্ত্রি করে তুলে রাখতেন নামাজ পরতে যাবার সময় গায়ে দেবার জন্য। এবং এ নিয়ে আমাদের কখনো মাথা ঘামাতে হবে এমন করে ভাবতে শিখিনি। শিত কালে ঈদ হলে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম গোসলের জন্য মা পানি গরম করে রেখেছেন। আগেই কিনে আনা সুগন্ধি সাবান নিয়ে বাবা আমাদের ভাই বোনদের একে একে নিয়ে বাথ রুমে ঢুকতেন আর ডলে ডলে গরম পানি সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দিতেন। গোসল হলে মা আবার ওই সব কাপড়গায়ে দিয়ে আতর মেখে দিতেন।

ওই সময়ে আমাদের ঈদের আনন্দ শুরু হতো রোজার শুরু যেদিন হতো সে দিন থেকেই। বাড়িতে মায়ের কোন সাহায্যকারী ছিল না এমনকি আমার কোন বড় বোনও ছিল না তাই মাকে সাহায্য করতে হতো আমাকেই। অন্যান্য ভাই বোনেরা বেশ ছোটই ছিল।

তখন আবার এখনকার মত চাকুরী জীবী দের উত্সব ভাতা বলে কিছু ছিল না যা দিয়ে ঈদের বাড়তি খরচ মেটাতে পারতেন। তখন যা পেতেন তা হচ্ছে যে মাসে ঈদ হচ্ছে সেই মাসের বা তার পরের মাসের অগ্রীম বেতন। যাই হোক

বাবাকে দেখেছি যে বছর আমাদের জন্য নতুন জামা জুতা কিনবেন তখন দাম বেড়ে যাবার আগেই রোজার শুরুতে আমাদের সাথে নিয়ে বাজার থেকে কাপড় কিনে আনতেন আর তাই কেটে মা নিজে সেলাই করে নিতেন। মেশিনে সুতা লাগিয়ে দেয়া বা কোন সেলাই ভুল হলে তা খুলে দেয়ার কাজটা মা আমাকে দিয়েই করাতেন। ফলে যা হবার তাই হোল। আমি নিজেও এক সময় মার মত কেমন করে যেন কাপড় চোপর কাটি কুটি থেকে সেলাই করা সব শিখে ফেললাম। মা যখন ফিতা ধরে গায়ের মাপ নিতেন তখন থেকেই নতুন কাপড়ের গন্ধ মাখা একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। আবার কিছুটা সেলাই করে গায়ের সাথে মিলিয়ে মা দেখে নিতেন সেই তখন থেকেই অস্থিরতায় থাকতাম কখন সেলাই শেষ হয়ে জামাটা আমার গায়ে লেগে যাবে। যে দিন মায়ের সেলাই, বোতাম লাগান, বোতামের ঘর কাটা সব শেষ করে গায়ে দিয়ে পরখ করতেন ইস তখন যে কি আনন্দ পেতাম তা আজ এই বার্ধক্যের প্রথম প্রান্তে এসে এখনও ভুলতে পারি না। সেলাইর প্রতিটা ফোঁড়ে মায়ের স্নেহ আর যত্নের ছোঁয়ার কি কোন তুলনা হয়? মায়ের নিজে সদ্য তৈরী করা জামা বা প্যান্ট ঠিক ভাবে গায়ে লেগে গেছে দেখে মায়ের মুখের মধুর তৃপ্তি মাখা মৃদু হাসিটা আজও ভুলতে পারি না।

মার ঐ শিক্ষা থেকে আমিও আমার মেয়েদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছি। আমার স্ত্রীও এমনি করে নিজের সন্তানদের জন্য নিজে হাতে পোষাক বানিয়ে দিত যখন ওরা ছোট ছিল। কাপড় সেলাই হলে তাতে নানা রকম হাতে কাজ করা এমব্রয়ডারি বা ফেব্রিক পেইন্ট দিয়ে আবার এক ধাপ সাজ সজ্জা দেখতে বেশ লাগত। সেই রেশ ধরে আমার মেয়েরা সেদিন বলছিল আব্বু যতই যা কিনে দাও না কেন সেই যে তুমি আর মা মিলে আমাদের জামা কাপড় বানিয়ে দিতে সে গুলি গায়ে দিয়ে যে আনন্দ পেতাম আজকাল এত দামের এই সব কাপড় গায়ে দিয়েও আর তেমন আনন্দ লাগে না। মেঝ মেয়ের এই কথা শুনে বড় এবং ছোট মেয়ে এক সাথে তাল মিলিয়ে বলে উঠেছিল হ্যা আব্বু মেঝ ঠিক বলেছে!! শুনে কেন যেন আমার চোখ দুটি ভিজে এসেছিল সাথে সাথে ওদের তিন বোনকেই বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম।

আজকাল দেখি যুগের পরিবর্তনে বাবা মা ছেলে মেয়েদের সাথে নিয়ে তৈরী পোষাকের দোকান ঘুরে ঘুরে নামি দামি কোম্পানির লেবেল আটা পছন্দের কাপড় বেছে চড়া দামে কিনছে। এতে আর যাই হোক মায়ের ছোয়া মাখা মমতার স্পর্শ কি পায় আজকের এই ছেলে মেয়েরা?আনন্দের প্রথম পশলার ঘাটতি তো এখানেই থেকে যাচ্ছে। এ কথা ভাবার সুযোগ কি হয় যে ঈদের আনন্দের প্রথম অনুভব মায়ের স্পর্শ আমার সাথেই আমার গায়ে লেগে রয়েছে?নাকি দামী ফ্যাশন কোম্পানির লেবেল লাগানো পোষাক মায়ের বিকল্প স্বাদ দিতে পেরেছে জানি না।

এর পর আসছি খাবার দাবারে। রোজার শুরু থেকেই মাকে দেখতাম সামান্য একটু করে ময়দা মেখে হাতে নিয়ে চিমটি কেটে দুই আঙ্গুলে ডলে জিরার আকারে এক রকম সেমাই বানাতেন আমাদের মানিকগঞ্জের ভাষায় এই সেমাইর নাম যব দানা। অবসরে বেশ কয়েক দিন ধরে বানিয়ে জমা করে রোদে শুকিয়ে কাচের বয়াম ভরে রেখে দিতেন। ঈদের দিন সকালে এই যব দানা ঘিয়ে একটু ভেজে সেমাইর মত কি করে যেন রান্না করতেন আমার খুবই প্রিয় সেমাই ছিল এটা। সারা রোজা ভরে পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে ইফতার বিলি করতেন আর সেই ইফতার সাজান খঞ্চা বা ট্রে সুন্দর মায়ের হাতে কাজ করা একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে আমার হাতে দিয়ে বলে দিতেন যা এটা ওদের বাড়ি দিয়ে আয়। এ ভাবে এক এক করে এলাকার প্রতিটা বাড়িতেই দেয়া হতো। মাঝে মাঝে এর মধ্যে আমার বিশেষ বন্ধুর বাড়িতে আগে বা একটু বিশেষ আয়োজন করে দেয়ার জন্য আমি আবার বায়না ধরতাম। আবার ওই সব বাড়ি থেকেও একেক দিন বা কোন দিন এক সাথে কয়েক বাড়ি থেকেও ইফতার আসত।

আবার বাবার কলিগ বা বন্ধুদের বাবা ইফতার করার জন্য দাওয়াত করতেন তাদের বাড়ি যেতাম। আমাদের বাসায় ও তারা আসতেন। এই দিন গুলিতে ছিল আনন্দের আর এক মাত্রা। তবে একটু দূরে কোথাও হলে তারাবীর নামাজে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে বাবা দূরে কোথাও যেতে চাইতেন না।

রোজার শেষ দিনে ইফতারি করেই বের হতাম বাসার বাইরে বন্ধুদের সাথে চাঁদ দেখতে। চাঁদ দেখা গেলে সে কি আনন্দ চিতকার! চিতকার করতে করতেই বাসায় আসতাম, “মা মা চাঁদ দেখেছি, কাল ঈদ হবে” কই দেখি বলে মা বাবাও বের হতেন। চাঁদ দেখেই বাবা ব্যাগ নিয়ে বের হতেন বাজারে সাথে আমার হাত ধরে নিয়ে যেতেন। মাংশ, চাউল, সেমাই, বাদাম ইত্যাদি নানা কিছু যা যা মা একটা লিস্টে লিখে দিয়েছেন তাই দেখে লিস্টের সাথে মিলিয়ে বাবা এক এক করে কিনে নিতেন। ফিরে এসে দেখতাম সারা মহল্লায় মশলা বাটার ধুম। তখন আবার এখনকার মত ঘরে ঘরে ফ্রিজ নামক ঠান্ডা আলমারি ছিল না। আদা, রসুন সহ নানা মশলার গন্ধে বাসায় ঈদ শুরু হয়ে যেত এখন থেকেই। অনেক রাত অবধি মা নানা পদ রান্না করে রাখতেন। আমিও পাশে বসে থাকতাম। মা কে এটা ওটা এগিয়ে দিতাম কিংবা অন্তত ছোট ভাই বোনকে সামলাতাম। সে যে কি আনন্দ তা কি আর শুধু ভাষায় প্রকাশ করা যায়? এ যে শুধুই অনুভবের, একান্ত হৃদয়ের গভীরের অনুভুতি। মায়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখে বিন্দু বিন্দু ঘামের ঝিলি মিলি কি আর কিছুতে পাওয়া যায়? সে যে এক স্বর্গীয় আনন্দ।

ঈদের সকালে সেমাই, ক্ষীর বা পায়েস বা ফিরনি আর গোরুর মাংস এবং খিচুড়ি, নামাজ পরে এসে দেখতাম মা সব রান্না বান্না শেষ করে গোসল করে নতুন শাড়ী থাকলে তাই পরে থাকতেন। এসেই আগে মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করে বাবাকে সালাম করতাম পরে বাবার সাথে ভাইয়ের সাথে কোলা কুলি। এবার বাবা কিছু টাকা দিতেন সারা দিন ধরে ইচ্ছে মত খরচ করার জন্য। নামাজের মাঠে সবার সাথেই কোলাকুলি করে এসেছি।

নামাজ সেরে এসে আবার পোলাও মাংশ খেয়ে বের হতাম মহল্লায় সব বাসায় চাচীদেরকে সালাম করতে। সেখানেও কিছু খেতে হতো। সারাটা দিনই বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি এটা ওটা দেখা। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে চোখে ঘুমের রেশ নিয়ে বাসায় ফিরে এলে মায়ের এক পশলা মিষ্টি বকুনি হজম করে বাথরুমে ভরা বালতিতে দাঁড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে মায়ের আচল দিয়ে হাত মুখ মুছতাম। মা আবার আর এক দফা বকে রাতের খাবার আয়োজন করতেন রাতে সাধারনত বিরিয়ানি হতো।

সারা দিন বাসায় কে এলো বা মা বাবা কোথায় গেছেন কিছুই জানতাম না। বাবা, ছোট ভাই বোন সবাই মিলে খেয়ে দেয়ে সাথে সাথেই এত কাঙ্খিত মহা আনন্দের ঈদের সমাপ্তি ঘটিয়ে বিছানায় শুয়ে পরতাম। সারা দিনের ফিরিস্তি ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পরতাম কিছুই টের পেতাম না।

আজ এই জীবন সায়াহ্নে এসে ভাবি আহা অমন ঈদ যদি আমাদের ছেলে মেয়েরা দেখতে পেত!!

দুগগা পুজা’ ও একটি বাল্যকাল

রাজা সরকার

আমাদের সেই দুর্গা পুজো তখনও এখনকার মত শারদ উৎসবে পরিণত হয়নি। তবে একটা উৎসবের ছোঁয়া থাকতই। যদিও বড়রা সেটাকে যথা সম্ভব পুজার্চনার মধ্যেই দেখতে ভালবাসতেন। চাইতেনও ছোটরাও তাই দেখুক। ছোটরা হয়তো তাই দেখার চেষ্টা করতো, কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে যাবার প্রবণতা যে ছোটদের প্রাণ চাঞ্চল্যের একটা বিশেষ লক্ষণ সেটা বড়রা হয়তো দেব দেবতা নিয়ে বড় মাপের এইসব কর্মকান্ডে মনে রাখতে পারতেননা বা মেনে নিতে পারতেননা। একে গ্রামের বাড়ির পুজো, সেখানে আচার নিয়মের ব্যতয় ঘটা মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। ফলে ছোটদের কপালে এই উপলক্ষে অবধারিত কিছু বকাঝকা এবং কানমলা বরাদ্দ থাকতই। যদিও বড় শরীকী পরিবারের ঝাক বাঁধা ছোটরা এসব অগ্রাহ্য করতে বেশি সময় নিতনা। সময় নিলে ভাগের আনন্দ কম পড়বে যে।

আমি যে পুজোটার কথা বলছি তা আমার ছোটবেলাকার পুজো। ঐ ঝাঁকবাঁধা ছোটদের মধ্যে গুটিগুটি পা’য়ে আমিও ছিলাম। গ্রামজোড়া চার শরীকের পরিবারের বাৎসরিক এই পুজোই ছিল সবচাইতে বড় কর্মকান্ড। তবে আমদের ছোটদের পুজোটা শুরু হয়ে যেত অনেক আগে, মানে যখন কাঠামো পুজো হতো। আর তখন থেকেই আমদের বাড়ির মন্ডপ ঘরে এসে থাকতে শুরু করতেন মুর্তি বানানোর কারিগর নরেশ পাল। উনি আমাদের নরেশ কাকু। শান্ত, ফর্সা, ছিপ ছিপে চেহারার মানুষ। আমাদের সঙ্গেই তার যাবতীয় ভাবসাব। প্রায় মাসাধিক কাল তিনি আমাদের বাড়িতে থাকার জন্য চলে আসতেন। সঙ্গে থাকতো নানান জিনিষ পত্রে ঠাসা একটা চটের ব্যাগ ও একটি টিনের বাক্স। এই সময় চারদিকে প্রকৃতি জুড়েও শুরু হয়ে যেত নানা পরিবর্তন। যেমন মাঠে ঘাটে জমে থাকা বর্ষার জল শুকিয়ে যাওয়া শুরু হত। এখানে ওখানে দেখা যেত কাশফুল। বর্ষার কাদা প্যাচ প্যাচে ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে ভেবে আমাদের মন আনন্দে অস্থির হতে শুরু করতো। ইস্কুল যাতায়াতের পথে এই সময় যেন আমরা টের পেয়ে যেতাম নরেশ কাকুর আসার সময় হয়েছে। যেদিন সত্যি সত্যি তিনি এসে যেতেন সেদিন থেকেই আমাদের মনে মনে উৎবের সুচনা হয়ে যেত। নিয়ম করে ইস্কুল থেকে ফিরে মন্ডপে ঝাঁক বেঁধে হাজিরা ত আছেই, পারলে ইস্কুল যাওয়ার আগে একবার উঁকি দিয়েও আসা হত। আর তা নিয়ে ইস্কুল যাতায়াতের পথে নানা রকম চর্চা, উত্তেজনা, ঝগড়া সবই হতো।

প্রতিমার কাঠামো নির্মাণ দিয়ে শুরু আর দেবীর চক্ষুদান পর্বের মধ্য দিয়ে শেষ হতো নরেশকাকুর কাজ। তিলে তিলে তার এই প্রতিমা গড়ার ভেতর আমরাও তিলে তিলে এতটাই সম্পৃক্ত হয়ে যেতাম কোন কিছুই আমাদের চোখের আড়ালে হওয়া সম্ভব ছিলনা। প্রতিমা দুমেটে হওয়ার পর হয়তো কোথাও একটু ফাটল দেখা গেল—সিংহের একটা দাঁত কোন ভাবে হয়তো ভেঙ্গে গেছে—অসুরের আঙুল—কার্তিকের বাহন ময়ুর—,কোন দিক বাদ যেত না। মহালয়ার পর আর আমাদের দিয়ে পড়াশোনা করানো খুব দুস্কর হয়ে পড়তো। নমো নমো করে বড়দের দেখানোর মত একটু আধটু করেই দে ছুট মন্ডপের দিকে। কারণ এই সময় নরেশকাকুর হাতে উঠতো রঙ তুলি। প্রতিমার অবয়বে রঙ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মনেও কেউ রঙ লাগাতে শুরু করতো। তার উপর এইসময় আমাদের জন্য আরেকজন বিস্ময়কর মানুষের আবির্ভাব ঘটত তিনি হলেন ঢাকি। সাধারণত নতুন জামা কাপড় সহ পুজোর যাবতীয় বাজার আসত শহর থেকে নৌকো করে। পঞ্চমী কি ষষ্ঠী হবে, এমনই একদিন অনেক দূর থেকে আমরা শুনতে পেতাম ঢাকের আওয়াজ। পুজোর বাজার বোঝাই নৌকোতে ক’রে আসছেন আমাদের ঢাকিও। ঢাকের আওয়াজ কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়

সমস্ত গ্রাম জুড়েই আমাদের ঝাঁক বাঁধা ছোটদের দল উল্লাসে ফেটে পড়তাম । আর সঙ্গে সঙ্গেই দে ছুট পুকুর পাড়ের দিকে—যেখানে এসে নৌকোটা ভিড়বে । আমাদের পেয়ে ঢাকিও পরম উৎসাহে তার কাজ করতে করতে মন্ডপের সামনে এসে কিছুক্ষণ বাজিয়ে তারপর তার থামা ।

আমরা এইসময় থেকেই এতদিনের নরেশকাকুকে ছেড়ে একটু একটু করে ঢাকির দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করতাম । নরেশকাকুও দেবীর চক্ষুদান পর্ব সেরে যেন অনেকটাই আড়াল হয়ে যেতেন । দেখতাম সন্ধ্যারতির সময় ভীড় ভারাক্রান্ত মন্ডপের এককোনে অনেকের পেছনে দাঁড়িয়ে নরেশকাকু আরতি দেখছেন । এতদিনের লুঙ্গিপরা সাজ ছেড়ে এইসময় দেখতাম তার পরনে একটা খাটো ধুতি । গা'য়ে একটা নীল রঙের জামা । কেউ তাকে খেয়াল করছে বলে মনে হতোনা । পুরোদমে পুজোর কাজ শুরু হয়ে যেতেই আমরা আমাদের স্থায়ী ঘাঁটি করে নিতাম পুজোর মন্ডপে । নতুন জামা কাপড় পরে ওখানেই আমাদের দিনমানের বসবাস শুরু হয়ে যেত । আশেপাশের দশ গা' জুড়ে যেহেতু এই একটাই পুজো তাই ভীড়ও হতো ব্যাপক । ফলে ফাইফরমাশ খাটার জন্য এইসময় আমরা বেশ প্রস্তুত থাকতাম । কোনদিক দিয়ে যে দিন গিয়ে রাত এসে পড়তো টের পেতাম না । টের পেতাম তখন, যখন রাতে ঘুমোনোর জন্য খোঁজ পড়তো ।

স্বপ্নের ঘোর কেটে যেত দশমীর দিন । তার আগের নবমীর নিশিতে টের পেয়ে যেত বড়রা । তাই দশমীর সকালে যেন সবার মন খারাপ । তাই দেখে দেখে আমাদের মত ছোটরাও মন ভার করে ঘুরে বেড়াই । মাসাধিককালব্যাপী উৎসাহ উত্তেজনার এখন যেন অবসাদের বেলা । সবার চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট । দশমীর পুজোও খুব সংক্ষিপ্ত । দেখতে দেখতেই যেন শেষ । পিতৃগৃহ ছেড়ে মেয়ে দুগগা আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে । এত সংসারে খুবই দুঃখের কথা । বাড়িঘরে যত আত্মীয়পরিজন এসেছে তার মধ্যে যারা এ বাড়িরই মেয়ে, পুজো উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে, এই দুঃখের ছোঁয়া যেন তাদেরও লেগেছে । বিকেলের দিকে আজ আর আরতির প্রস্তুতি নেই । আজ বিকেল থেকেই বিসর্জনের বাজনা । তার মধ্যে মা'য়ের পা'য়ে সিঁদুর ছোঁয়ানো হয়ে যায় মেয়েদের । এই সময় কারো কারো চোখে জল দেখে আমাদেরও কারো কারো কান্না পেয়ে যায় ।

বিসর্জন আমাদের পুকুরেই হয় । মন্ডপ থেকে পুকুরপার বেশি দূর নয় । শেষ বিকেলে প্রতিমা মন্ডপ থেকে বাইরে এনে রাখা হয় । ভক্তপ্রাণ মানুষেরা শেষবারের মত প্রতিমা দর্শণ করে নেন । আমরা ছোটরা আর ঝাঁক বেঁধে থাকিনা । খুব মন খারাপ হলে যা করি,—মা, ঠাম্মা'র কাছাকাছি ঘুর ঘুর করি । অন্যদিনের মত আজো হ্যাজাক বাতি জ্বলল । অন্ধকার চিরে ছড়িয়ে পড়ল তার আলোও । কিন্তু আমরা আর তাতে তেমন সায় দিইনা । ঢাকের বাজনাও কেমন বুকভাঙ্গা আওয়াজে বেজে যায় । দূর থেকে শুনি, কিন্তু ধারে কাছেও যাইনা । অবশেষে একসময় চমকে উঠি ।"দুগগা মা' কি জয়" ধ্বনি শুনে । পরপর এই ধ্বনি দিতে দিতে অনেকে মিলে ধরা ধরি করে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে রাখে পুকুর ঘাটে । সেখানে আর একপ্রস্থ আরতির জন্য কিছু সময় রাখা হয় । তারপর পুকুরের জলে বিসর্জন । পুকুরপারের দর্শনার্থীদের মধ্যে মহিলারা কেউ কেউ এই সময় চোখে মুখে আঁচলচাপা দিয়ে কেঁদেও উঠেন । নিস্তরঙ্গ জীবনের মহার্ঘ্য ক'টি দিন যেন খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল । রেখে গেল এক ক্ষণিকের শূন্যতা । ধীরে ধীরে সকলেই ঘরমুখো । ফেরার পথে প্রায় নির্জন মন্ডপ ঘরের দিকে শুধু আড়চোখে একবার তাকাই । দেখি একটি ম্লান প্রদীপ জ্বলছে সেখানে । কিন্তু এত একা !

সেই যে আমার দিনগুলি

মাল্যবান

কে যেন বলেছিল কথাটা। কে ?

ওই সুনীল আকাশে সঞ্চরমাণ মেঘরাজি ? পরবর্তীকালে,বড় হয়ে, আপ্তবাক্যের মত রচনা বই থেকে যেমন মুখস্থ করতে হয়েছিল, 'শরৎকালের আকাশ অতি মনোরম। সুনীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়......' সেই পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা ? না, তখন তো রচনা বই পড়ার বয়েস হয়নি। আর কোন ঋতুতে কেমন আকাশ তেমন বোধও তৈরিই হয়নি। তবে ? কে বলেছিল ? বলেছিল যে বাতাসে উৎসবের সুর ? শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই যে পূজো এসেছে। তার মানেই নতুন পোষাক – তার মানেই মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখা – তার মানেই গ্যাস বেলুন – তার মানেই মাটির বেহালা বা বাঁশের বাঁশি আর মুগ্ধ চোখে দেবী অসুরনাশিনীকে দেখা কেমন তার পদতলে অসুর।

পদতলে অসুর । কী হিংস্র আর রক্তবর্ণ তার চোখ। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। একটা মহিষের পেট চিরে সে উঠে এসেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেবী দুর্গার দিকে। চওড়া বুক। কী চেহারা তাকিয়ে দেখার মত। বুকের ! একস্থানে একটি ক্ষতচিহ্ন আর মায়ের বর্শা এসে সোজা বিঁধেছে ওর বুকে।

বুকের মধ্যে দ্রিমি দ্রিমি। স্কুল শেষ হলে যেদিকে বাড়ি, যেপথে রোজকার বাড়ি ফেরার পথ সেপথে নয় অন্য পথ, একেবারে উল্টোপথে নিয়ে যাচ্ছে সুভাষ,বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সবচেয়ে ডানপিটে ছেলে। 'চল না ,একটা জিনিষ দেখাব'। 'দেরি হবে না তো ? বাড়িতে বকবে কিন্তু......' । 'না , যাব আর আসব'। সুভাষ হল এক বিস্ময়। কত খবর যে ওর নখদর্পনে কত ! জায়গার হদিশ সে দেবে রোজই । কোথায় পাখীর বাসায় ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে তাদের নরম গোলাপী ঠোঁটে পাখী মা খাবার গুঁজে দিচ্ছে তা নাকি-সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। কোথায় বৃষ্টির তোড়ে নর্দমা ওপচানো জলে মাছ ধরা পড়ছে, কোথায় রবারের বলের কারখানা এইসব। কিন্তু সেসব কথায় – সুভাষের বেত্তান্তের সাথে উৎসবের সম্পর্কটা কি ? আছে । কেননা সেই বলেছিল কথাটা, 'জানিস না পূজো এসে গেছে ! আর দুমাসও নেই। ' বলে হিড়হিড় করতে করতে টেনে নিয়ে গেল। 'চল না যাব আর আসব, এই তো কাছেই – বেশি দূরে না।'

মুন্ডহীন অসুর আর ভুঁড়িওয়ালা গণেশ

দূরে নয় বলে সে তো খালাস। কিন্তু দূর শব্দের অর্থ তার কাছে অন্যরকম। এ গলি সে গলি ঘুরিয়ে এনে ফেলল এক অর্ধেক টালি আর অর্ধেক টিনের ছাউনির মস্ত ঘরে। ঠাকুর গড়ার ঘর। ভাল কথায় আজ বড় হয়ে যাকে বলা চলে 'মৃৎশিল্পালয়'। চারপাঁচজন সে আধোঅন্ধকার ঘরে ঠাকুর গড়ার কাজ করে চলেছেন। রেড়ির তেলের কয়েকটি লম্বা কুপি আছে। বাইরে থেকেই উঁকি মেরে দেখা গেল অনেকগুলি প্রতিমা। কোন প্রতিমারই রঙ করা নেই, সব গুলিরই মাটির প্রলেপ লাগানো মাত্র। কিছু প্রতিমা কাঠামোর ওপর খড় বাঁধা। সুভাষই বলল , ওগুলোর ওপর মাটি পড়বে তারপর রঙ,তারপর গয়না। অবাক –বিস্ফারিত চোখ। এইসেই প্রথম এমন ! মা দুর্গা ই তবে- প্রতিমার গড়া দেখতে পাওয়া। একদিকে দেখা গেল কতগুলি মুন্ডহীন অসুর। সেগুলির মুন্ড কোথায় সুভাষকে জিজ্ঞেস করতেই মূর্ত্তি গড়া একজন বললেন, 'তোদের মুন্ডগুলো লাগাব, যা পালা, বাড়ি যা।' অন্য একজন বৃদ্ধ মতন কিছু বললেন ভেতর থেকে,কি তা এতদিনে মনে নেই, তবে সুভাষ হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আরো কিছু মুন্ডহীন মূর্ত্তি দেখা গেল যার ভুড়ি দেখেই বোঝ যায় সেগুলো গণেশের মূর্তি। যতদূর মনে পড়ে ওই বৃদ্ধ মানুষটি হুঁকো খাচ্ছিলেন। ঐ জিনিষটি চেনা। ঠাকুরদা খেতেন। মনে

হয় প্রতিমার ওই হতচ্ছাড়া রূপ ওই ছোটবেলায় এমন করে চোখের সামনে প্রতিভাত হওয়ায় কোনদিনই কোন প্রতিমার প্রতি ভক্তিভাব জন্মালো না। অনেকে বলা সত্ত্বেও কোনদিন দশমীতে দুর্গার চোখ অশ্রুছলোছল দেখতে পাইনি। মণ্ডপে হাতীর শুড়ওয়ালা গণেশ দেখলেও মনে মনে ভেসে উঠেছে ঐ মুন্ডহীন প্রতিমার আর তার পায়ের কাছে ইঁদুর।

কুটুরকুটুর নেঙটী ইঁদুর ও বাটার জুতো

যদিও বাবা ছিলেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাড়িতে ঢুকলেই পিন পড়ার শব্দ হত। কাছে ডাকতেন না খুব একটা। ছেলেপেলেরা ভয়ে ভয়ে থাকবে এটাই ছিল যেন শাসনের দস্তুর। কোন প্রয়োজনে আদেশ করতেন শুধু। অবশ্য অনেক পরে, পূর্ণবয়স্ক হয়ে যাবার পর এই মানুষটিকে চেনা হয়েছে অন্য রূপে। তবে সবচেয়ে ছোট সন্তান হবার সুবাদে ছোটবেলায় মুড ভাল থাকলে একটা অদ্ভুত সুরে ডাকতেন, 'কুটুর কুটুর নেঙটি ইঁদুর ,লম্ফ মহারাজ আয় চলে'। তখন খুব ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হত। সেবার কাছে দাঁড়াতে হঠাৎ অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে বললেন,পূজোয় কি চাই ? কেন যে কোন সাহস এসে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে দিল বেরিয়ে এল !, 'বাটার জুতো'।

বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই আসত আনন্দবাজার পত্রিকা। সেসময় সবচেয়ে যে বিজ্ঞাপণ মনের কোনে লোভ জড় করেছিল তা হল , 'পূজোয় চাই নতুন জুতো'। এরকম আরও দু একটি বিজ্ঞাপন ছিল আমার দিদির খুব প্রিয়। 'সুখী গৃহকোণ ,শোভে গ্রামোফোন' আর 'ফেমিনা স্নো'। এ নিয়ে ও মাকে বলছে এমন শুনেছি। বাড়িতে শুকতারা পত্রিকা ও সোভিয়েত দেশ ছাড়া আর কোনও পত্রিকা আসত না। পূজোর সময় দেবসাহিত্যকুটিরের কোন একটি পূজাবার্ষিকী আসতো। সেগুলোও মায়ের কাছে আবদার ও তারপর বাবার অনুমোদন সাপেক্ষে আসত। ফলত যা কিছু আবদার সব মায়ের কাছে। বাটার জুতোর কথা মাকেই বলা হয়েছিল প্রথমে। মা তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। আমাদের পরিবারের পক্ষে তখন বাটার জুতো পরা বিলাসিতার নামান্তর। যৌথ পরিবার, বাড়ি নয় একটা পাড়া যেন। বাবার আয়েই সব। পরে বড় হয়ে সেসব বোধগম্য হয়েছে। কিন্তু তখন বাটার জুতোর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখত। পাশের বাড়ির সমবয়সী কানাই দত্ত কালো রঙের বাটার জুতো পড়ে। আর আমাদের ছিল কেটস। প্রতি রোববার জুতো ভিজিয়ে খড়িমাটি দিয়ে বুলিয়ে নিলে শুকোলেই ধবধবে ফরসা।

বাবা সেদিন কি বলেছিলেন মনে নেই। তবে মহালায়ার আগেই,এটা মনে আছে,নিশ্চিতভাবেই মনে আছে আমার ও আমার খুড়তুতো দাদার জন্য দুজোড়া বাটার জুতো এসেছিল। আর সবার জন্য চটি। বাটার নয়। জুতোর মাপ নেওয়া হত কাগজের ওপর পা রেখে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে। পরে সে কাগজটিকে প্রণাম করতে হত। বিদ্যা বিদ্যা বলতে হত। বাবা সেই মাপ অনুযায়ী জুতো আনতেন। বছরে ঐ একজোড়া চটি। ছিঁড়ে গেলে দ্বিজেন মুদির দোকানের সামনের মুচি ভরসা। তবে এই বাটার জুতোটাকে কোনদিন সেলাই করতে হয়নি,তার আগেই ছোট হয়ে গিয়েছিল। কত কান্ড যে এটাকে নিয়ে মহালয়ার আগেই যে ! ওটা এসেছিল সেটা যে নিশ্চিত কেননা ওটা নিয়ে মহালয়ায় একটা কান্ড ঘটেছিল।

মহালয়া ও বিরাশিসিক্কার চড়

পূজো এসে গেছে ততদিনে চাউড়। 'মৃৎশিল্পালয়ে'আর যাওয়া হয়নি। মা জেনে গিয়েছিলেন যে ছুটির পর ওখানে গিয়েছিলাম। তারপরই কড়া নির্দেশ স্কুলের পরেই যেন বাড়ি চলে আসি। সে নির্দেশ অমান্য করার সাহস ছিল না। বস্তুত দৈনন্দিন শাসন মাকরতেন। ই-

কিন্তু মনকে তিনি কি আর আটকাতে পেরেছেন ? আর মনই বা তার শাসন শুনবে কেন ? বিশেষ করে অমন একরত্তি ছোট্ট একটি ছেলের মন ? সে জানালার গরাদ দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে আর মনে মনে কল্পনা করে কালো রঙের একটি চকচকে জুতো পরে সে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জানালা দিয়েও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার জো ছিল না। সামনে খোলা থাকতো পড়ার বই। পূজোর পরই বার্ষিক পরীক্ষা যে ! এমন কি মহালয়ার দিনও যে পড়তে হয়েছে সেকথা মনে আছে। মহালয়া ছিল আমাদের পূজোর আগমনীবার্তা নয় শুধু আরো অনেক কিছু। মহিষাসুরমর্দিনী নামক শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ওই স্তোত্রপাঠ সেই বয়েসে কিছুই বুঝতাম না কিন্তু ঐ সুর ও আবহ মনে এমন আবেশ তৈরি করত যে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতো যেন তুষারশুভ্র হিমালয়ের থেকে দেবতারা সকলে বরাভয় দিচ্ছেন আর পাহাড়ঘেরা ময়দানে মহিষাসুরের সাথে জোর লড়াই করছেন দেবী দুর্গা। মায়ের কাছে বারবার গল্প শুনে শুনে মনের মধ্যে এমনই ছবি তৈরি হয়ে যেত আগে থেকেই, মহালয়ার অনুষ্ঠান শোনার সময় শুধু সেই ছবিকে মিলিয়ে নেওয়া। দেবীর বাহন সিংহ যেন তেড়ে আসছে মহিষের দিকে আর দেবী এক এক অস্ত্রে ঘায়েল করছেন অসুরকে। সেই ছোটবেলায় অসুরই ছিল একমাত্র ভিলেন। তারপর কেবল অপেক্ষা করতাম কখন সেই বিখ্যাত স্তোত্রপাঠ হবে 'যা দেবী সর্বভূতেষূ শক্তিরূপেন সংস্থিতা'। ছোটবেলার মহালয়ার আকর্ষণ ছিল যেন ওই লাইন ক'টি। সারা গায়ে যেন শিহরণ বয়ে যেত।

খুব ভোরে উঠিয়ে দিতেন মা। বাড়িতে একটি ভালব্ সেট জার্মানির টেলিফানকান রেডিও ছিল ,বড় ধরনের। তার ওপরের ডানদিকে ছোট্ট একটা জানালায় সবুজ লাইট জ্বলত। তাতে একটি ঘন সবুজ রেখা সরু হয়ে থাকলে প্রতীয়মান হত যে রেডিও স্টেশনটি ঠিকমত ধরা হয়েছে। আমরা বিছানায় বসেই অনুষ্ঠান শুনতাম। মা গায়ে চাদর পরিয়ে দিতেন। ঘাড়ের কাছে চাদরের দুপ্রান্ত গিঁট দিয়ে দিতেন। চাদরের কথাও স্পষ্ট মনে আছে। সুতির চাদর , সরুপাড়ে ফুলপাতার প্রিন্ট।

আমার বাটার জুতো হওয়াতে মেজদা খুব খুশি ছিল না। সেও ছোট ছিল তার অখুশী থাকাটাই স্বাভাবিক। সেবার আমার মেজদা মহালয়ার পর আমার জুতো নিয়ে কিছু ব্যঙ্গ করছিল,আর তা করছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ওই স্তোত্রপাঠের অনুকরণে। ব্যস, সাথে সাথে বাবার এক বিরাশিসিক্কার চড়। মেজদার সে কি কান্না। সে কান্না দেখে আমার মনও খুব মুষড়ে গিয়েছিল।

আমাদের পরিবারে এত মানুষ এত সদস্য যে সকলকে বাবা সন্তুষ্ট করতে পারতেন না, সম্ভব ছিল না। বাবা ভারতে এসেছিলেন স্বাধীনতার পূর্বে। তারপর একে একে বাবার ওপর চেপে বসেছিল নানান দায়। তখনকার দিনে এরকমটাই ছিল। দূর সম্পর্কের নানান আত্মীয়দের ছেলে মেয়েরা আমাদের পরিবারে সামিল হয়েছিল। এছাড়া আমার খুড়তুতো ও পিসতুতো ভাইবোনরা তো ছিলই। ফলে বাবার পক্ষে একা সব ইচ্ছেপূরণ করা সম্ভব ছিল না। নিজের ছেলেমেয়েদের যে আলাদা করে সাধ মেটাবেন সে মানসিকতাও ছিল না। পরে বড় হয়ে এসব বুঝেছি,যখন বাবা হয়ে উঠেছিলেন বন্ধুর মত। আজ যখন নিজে আর্থিকভাবে মোটামুটি সঞ্ছতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছি,তখন বাবা পাশে নেই।

গ্যাস বেলুন,মাটির বেহালা,ঝুমঝুম চানাচুর আরো কত কি

মহালয়ার পর মন উচাটন হয়ে উঠত আর সকলের মতই। পড়ায় কিছুতেই মন বসত না। কিন্তু মা ছাড়তেন না। পূজোর পরই পরীক্ষা। অ্যানুয়াল পরীক্ষা। কিন্তু সেসময় একটি তক্তপোষে ভাইবোনেরা সকলে পড়ছি,আর মাঝে মধ্যেই আমাদের টুকটাক গল্প চলছে। কোথায় কেমন প্যান্ডেল হল ,কার প্যান্ডেল ভাল বালকবৃন্দ ক্লাব না মিলন সংঘ এইসব। কোথায় কত বড় ঝাড়বাতি,কারা গ্লোব লাগিয়েছে। তখন ঝাড়বাতি, গ্লোব ছোট লাইটের ওপর রঙীন কাগজের চেইন এই ছিল মোটামুটি আলোকসজ্জা। কিছুতেই মন একাগ্র করা যেত না পড়ায়। কিন্তু এইসব গল্পগুজবের কথা কানে এলেই মা রান্নাঘর থেকে চীৎকার

করে উঠতেন। ফলে আবার শুরু হয়ে যেত পড়া। পড়তে হত, কেননা তাহলেই অনুমতি মিলত গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা পার করে বালকবৃন্দ ক্লাবের মাঠে যাবার। মহালয়ার আগে থেকেই দেখেছি বাঁশ পোঁতা হয়েছে,প্রায় প্রতি বিকেলেই ওই মাঠ পেরিয়ে, নতুন রাস্তা পেরিয়ে যেতাম (রোড .টি.আই.যার বর্তমান নাম সি) বেলেঘাটা লেক যার পোষাকি নাম সুভাষ সরোবর – দেখতাম ত্রিপল টাঙিয়ে কাপড়ের আস্তরণ পড়ছে প্যান্ডেলে। এরপর আর কোনোক্রমেই ঘরে মন টিঁকতে পারে না।

সপ্তমী থেকে নবমী মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখা। বাবার সময় হত না ,হলেও আমার মনে নেই উনি আমাদের নিয়ে ঠাকুর দেখেছেন কিনা। ঠাকুর বলতে বেলেঘাটা অঞ্চলের কয়েকটি ঠাকুর। খুব আকর্ষণের ছিল বালকবৃন্দ, মিলন সংঘ, ঘুঘুবাড়ির বর্তমান) চিংড়িঘাটায় পূজো। যতদূর মনে পড়ছে একবার কেউ (শেয়ালদার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়ে ছিল। ফেরার সময় আমি বাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তবে যেদিন ঘুরতাম তা বাদে বালকবৃন্দ ক্লাবের মাঠে মা বসিয়ে দিয়ে যেতেন,আবার রাতে এসে নিয়ে যেতেন। কেননা তা ছিল বাড়ির খুব কাছেই।

পূজো দেখতে যাওয়া মানে অবধারিত ভাবে আমার লাগত গ্যাস বেলুন। মাটির বেহালা আর বাঁশের আড়বাঁশি। আর একটা জিনিষ মাটির মালসার ওপর চামড়া লাগানো তাতে লাল রঙ দিয়ে আলপনা করা, এমন কৌশল থাকতো যে দড়ি দিয়ে ওটাকে টানলে টকা টক্ টকা টক্ শব্দ তুলতো। এছাড়া বায়োস্কোপ দেখতাম। একটি গোলাকার বাক্সের মত তার ওপর রেকর্ড বাজতো আর বাক্সটির গায়ে কয়েকটি ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে আমরা দেখতাম তাজমহল কুতুবমিনার এইরকম নানা ছবি। লোকটি চেল্লাতেন , দেখো দেখো দেখো দিল্লীকা কুতব মিনার দেখো। একটি খাবার জিনিষের কথা মনে আছে, যেমন একটি তেক চকচকে বাঁশের আগায় জড়ানো একধরণের লজেন্স বিক্রি হত এখন হয় কিনা জানি না, দেখিনা কোথাও। বিক্রেতা টেনে টেনে ছিঁড়ে বিক্রি করতেন। বেশ রামধনু রঙের। এছাড়া পায়ে হাতে ঘুঙুর লাগিয়ে চানাচুর বিক্রেতা চানাচুর বিক্রি করত,তার মুখে থাকতো চোঙা মতন। আর মেসিনে ঘুরিয়ে রঙীণ সোনপাপড়ি - এটা এখনো দেখি, নতুন আঙ্গিকে। মাংসের ঘুঘনি। আর অবশ্যই মোগলাই আর মাংস। এসময় মা কিন্তু সব আবদার মেটাতেন।

ঘুঘুবাড়ির শোভাযাত্রা কুচোনিমকি আর বোঁদে

দশমীর সন্ধ্যাবেলা বিদায়ের ও বিষাদের সুর,কিন্তু তার আগে এক হৈ হৈ কান্ড। পাড়ায় গলিতে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর আসছে ঘুঘুবাড়ির ভাসানের শোভাযাত্রা আসছে কিনা। এই শোভাযাত্রাই ছিল এক দারুণ আকর্ষণ। যেইমাত্র খবর এল শোভাযাত্রা আসছে অমনি হুলুস্থুল পড়ে যেত , সব পড়িমড়ি করে ছুট ছুট বড় রাস্তায়। বিরাট শোভাযাত্রা। মাথায় রেড়ির তেলের গ্যাসবাতি আর ব্যান্ডপার্টির কথা আমার মনে আছে। রাস্তার দুধারে লাইন দিয়ে দর্শনার্থী, বাড়ির মেয়ে বুড়ো বুড়ি সকলেই। একের পর এক শোভাযাত্রা আসছে বিভিন্ন ক্লাবের। আমরা দেখছি। এই একটা চলে গেল বাড়ি ঢুকে গেলাম ,কিছুক্ষণ পর আবার খবর এল ঐ আসছে মিলন সংঘের শোভাযাত্রা। আবার পড়িমড়ি ছুট ছুট।

এর আগে অবশ্য বালকবৃন্দ ক্লাবে মা দেবী দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়ে এসেছেন,বিদায় দিয়ে এসেছেন, আমিও গেছি তার সাথে। তারপর সকলকে প্রণাম করা। আর মা তখন আমাদের মিস্টি দিতেন।বিশেষ করে মায়ের হাতের নারকেলের নাড়ু ও মায়ের স্পেশাল টাটকা নাড়ু। নারকেলের সাথে যথেষ্ট পরিমান ক্ষীর দিয়ে এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট গোলাকার ক্ষীরভাজা থাকত। এ নাড়ু মা প্রতিবছর করতেন। নাড়ু মোয়া আমাদের সবসময় মজুদ থাকতো। কিন্তু বিজয়ার জন্য মায়ের কুচো নিমকি আর নাড়ু , তা তিলেরই হোক আর নারকেলেরই হোক কী সুস্বাদু লাগত !

বিজয়ায় প্রণাম করতে হত সব বড়দের। পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণাম করতে হত। সব বাড়িতে। আর প্রায় সব বাড়িতেই সেই কুচো নিমকি আর বোঁদে কমন। এ নিয়ে শেষমেষ আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতাম যে আমার মায়ের কুচোনিমকিই সবচেয়ে সেরা। হয়তো সব ছোটদের কাছেই তার মায়েরটা।

ছোটবেলা ছোটবেলা

ছোটবেলাগুলো ছোটবেলার মতই। সবকালে। আমাদের সময়েই হোক আর এখনই হোক। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ভিন্নতা এক এক রকম হলেও ছোটদের কল্পনার জগত একই রকম। তার চৌহদ্দির মধ্যে সে কল্পনার জাল বোনে। আমাদের সময়েও তাই। আমাদের খুব বিলাসের জীবন ছিল না। যা পেয়েছি,তাইই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছি। একবার বাটার জুতো আর বড় হয়ে যেবার 'রাজকুমার' সিনেমা বেরুলো সেবার টেরিকটের জামা ও তাতে এমব্রডয়ারি কাজকরা রাজকুমার জামা বেরিয়েছিল। টেরিকটের জামা কোনোদিন পরিনি তাই সেজন্য আমরা সব ভায়েরা মা মারফত বাবার কাছে আবেদন করেছিলাম। বাবা তা রেখেছিলেন। এছাড়া আর কোন আবদার করিনি।

এই লেখাটি মূলত আমার তৃতীয় শ্রেণীর সময়কার। আরো কিছু কথা আসছিল মনের ভেতর কিন্তু এমনিতেই এটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কলেবর পেয়েছে তাই এ পর্যন্ত পাঠক পড়বেন কিনা এ সন্দেহ মনের ভেতর উঁকি দিতে শুরু করেছে। তবু চেষ্টা করেছি ঐ সময়ের কিছু কথা বলবার। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে মাঝপথে আমরা মফস্বলে চিরকালের মত চলে আসি। তখনও আমি যথেষ্ট ছোট। তারপরের পূজোর স্মৃতি গ্রামের পূজোর স্মৃতি। সে অন্য গল্প। অন্য সময়। অন্য স্মৃতিকথা।

পুজো

সুশান্ত কর

(তখন ১৯৯৫। পুজোর ক'দিন আগে মামার বাড়ি গেছি দিন দু'য়ের জন্যে। ছেলেবেলা কখনো কখনো পুজোতে মামার বাড়ি যাওয়া, কুশিয়ারা নদির কূলে বিসর্জন দেখার এক আলাদা আমেজ ছিল। কেন জানেন, ওপারেই যে বাংলাদেশ। জকিগঞ্জের হাজারো লোক ওপারে ভিড় জমায় করিমগঞ্জে দেবীর বিসর্জন দেখতে। তখনও আমি বাড়ি ছাড়া হইনি। কিন্তু আঁচ করছিলাম, আমাকে মাথুর যাত্রা করতে হবে। মন বিষন্ন ছিল। তেমনি একরাতে কোনো এক কাগজে শালিমার তেলের এক বিজ্ঞাপনে দেখলাম, পুজো মানে...। ধুর এ আবার কবিতা বুঝি। আমি ওদের কবিতাটা শুদ্ধ করে দিলাম এরকম । এতে অবশ্যি করিমগঞ্জ নেই। আছে শিলচর। লেখা হয়েছিল ১১ থেকে ১৪ অক্টোবর, ৯৫)

শিশির ভেজা শিউলি তলে
রোদের লুটোপুটি;
পুজো মানেই ভিড়ের ট্রেনে
জানালা তোলা ছুটি

পুজো মানেই ঘরের টানে
বাঁধন যত ছেঁড়া;
কাশের বনে পথ হারিয়ে
ছেলে বেলায় ফেরা।

পুজো মানেই সে কবেকার
প্রেমতলার মোড়;
তনুদীপুর সাথে সেবার
মিশন রোডে ভোর

ছোট বৌদি চায়ের কাপে
কত দিনের পর;
পুজো মানেই, কোথায় থাকে
তরুণিমার বর?

এবং তারপর...

বিসর্জনে ঢাকের কাঠি
বেলুন সাদা লালে;
স্টেশন জুড়ে ধোঁয়া এবং
টোল পড়ে না গালে।

সেইসব আলোমাখা উৎসব

মেঘ

ঈদগুলো পূজোর মতো প্রতিবার শরৎকালে আসে না। কখনো শীত, কখনো চৈত্রের খরতাপ কখনো বা গ্রীষ্মের দাবদাহ নিয়ে আসে অর্থাৎ কিনা প্রতি বছর বেশ ক দিন করে এগিয়ে আসতে আসতে সব ঋতুর ছোঁয়াতেই ঈদের আনন্দ- মিশেথাকে। দুটো ঈদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয় বলে ছোটবেলায় রোজার ঈদ প্রিয় হলেও মন খারাপ করতাম কোরবানি ঈদের শেষ বেলায় কেননা আবার বছর ঘুরে সেই ঈদ আসবে। ছোটবেলার উৎসবের কথা লিখতে গেলে শুধু ঈদ নয়, পূজো, মেলা এসবের স্মৃতিও কম কিছু নেই। এক এক করে বরং বলি।

রোজার ঈদ

রোজা শুরু হলেই একমাসের জন্য খাবার দাবারের ধরন পুরো পাল্‌টে যেত। দৈনন্দিন জীবনযাপনের থেকে আলাদা ধারার সেদিনগুলো শুরুতে খুব ভালো না লাগলেও দিন দশেকের মধ্যে অভ্যাসটা বদলে যেত। আমরা ছোটরা রোজা রাখতাম না কিন্তু রোজার দিনে সকলের সামনে কখনো খেতাম না। চুপটি করে রান্না ঘরের এক কোণে সকাল বা দুপুরের খাওয়া সেরে নিতাম। সকালে চিরাচরিত খাবারের বদলে তখন দুধ, মুড়ি বা চিড়ে, কলা আর দুধের সর থাকত। এই খাবার আমার এত প্রিয় ছিলো বিশেষ করে ঘন দুধের পুরু হল্‌দেটে সর। দুপুরেও সেহেরির জন্য (ভোর রাতের খাবার) করা ঘন ডাল ভর্তা আর সাথে গরম ডিম ভাজা আর ঘি এই ছিলো বেশীর ভাগ দিনের খাবার, আর তাতেও আমরা খুব স্বাদ পেতাম। শেষের দিকে সাতাশ রোজা থেকে ছোটদের রোজা করবার অনুমতি মিলত মায়ের কাছ থেকে।

রোজার ঈদের কেনাকাটা বরাবর মা করতেন। আমরা মফস্বলে থাকলেও মার রুচিবোধ ছিলো একেবারে আলাদা। রোজার মধ্যেই মা একা ঢাকায় এসে ঈদের কেনাকাটা করে যেতেন। সবার জন্য জামা জুতো ঢাকা থেকেই মাপমত কেনা বা তৈরী হয়ে আসত। এ ব্যাপারে বাবার কোন ভূমিকা ছিলো না। ঈদের আগে ঊনত্রিশ রোজাতে বাবা ঈদের স্পেশাল মেনুর বাজার সারতেন, সে সময় দেখা যেত মাছওয়ালা বা সবজিওয়ালার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে গুচ্ছের মাছ সবজিও এনেছেন। ঈদে পোলাও মাংসের ভিড়ে গাদাগুচ্ছের মাছ সবজি দেখে মা খুব রেগে যেতেন আর হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে বাবার হাসিমুখটা ভীষণ দর্শনীয় তখন।

ঊনত্রিশ রোজার ইফতার করতাম আমরা খোলা ছাদে বসে। ইফতারের আগেভাগেই আকাশে চাঁদ দেখার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। বাবাও আমাদের সাথে যোগ দিতেন। চাঁদ দেখা গেলে মা এসে সামিল হয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন রান্নার মেনু নিয়ে আর আমরা তখন এক ছুটে টিভির সামনে সেই বিখ্যাত ঈদের গানটি শোনবার জন্যরমজানের - ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। ততক্ষণে নারকেলের সাদা বরফি চুলো থেকে নেমে গেছে। সেগুলোকে বরফির আকার দিচ্ছেন বাবা। মাংসের টিকিয়াটাও হয়ে গেছে তখন। মুহূর্তে উৎসবের আমেজ সারা বাড়ি জুড়ে।

ঈদের দিন

কাকভোরে সেদিন ঘুম ভেঙে যেত। চোখ খোলার আগেই মনের মধ্যে গুনগুন শুরু হয়ে যেত আজ ঈদ, আজ ইদ। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে

এক ছুটে বাবার কাছে। ঈদের দিনের সকালে বাবা বরফি আর চা খাবেন এই দৃশ্যটা মনে এত আনন্দ এনে দিত যে কিছুতেই এটা মিস্ করতে চাইতাম না। তারপর বাবা নামাজে যাবেন, নামাজের প্রস্তুতির সাথে সাথে সকালের বিশেষ বিশেষ খাবার মানে সেমাই, পায়েস, হালুয়া, লুচি, খিচুড়ি ইত্যাদি নানা খাবারে টেবিল ভর্তি। বাবা সামান্য মুখে দিয়ে নামাজে বেরিয়ে যেতেন আর আমরা সব হুটোপাটি করে গোসলে চলে যেতাম বাবা ফিরে আসবার আগেই আমরা নতুন জামাকাপড় পড়ে তৈরি থাকব বলে। নামাজ সেরে বাড়ি ফিরলেই ঝপাঝপ বাবা-রমায়ের পা ছুঁয়ে সালাম তারপর বাবা সাথে বেরিয়ে পড়তাম আত্মীয়দের সাথে দেখা করার জন্য। বাবা নিজেই ড্রাইভ করতেন, কমবেশি সবার বাড়ি গিয়ে দেখা করতেন, তারপর দুপুরে ফিরে একসাথে দুপুরের খাওয়া সারতাম।

দুপুরে খাবার পর পরই বাবা নিজের কাজে ব্যস্ত হতেন আর আমরা আরেক দফা কাপড়শজামা পালটে তখন প্রতিবে-ীর বাড়ি ঘুরছি নাহলে বাড়িতে অতিথিদের সঙ্গ দিচ্ছি। আস্তে আস্তে ঈদের সন্ধ্যে রাতের দিকে গড়াতেই চোখের পাতা ভারী হয়ে আসত। পরদিন সকালবেলা উঠেই মনে হত ঈদ শেষ, আবার সেই একঘেয়ে জীবনে ফেরা।

অন্য ঈদটি

বকরী ঈদ বা কোরবানি ঈদ খুব ঘুরে বেড়াবার ঈদ নয়। প্রত্যেক ঘরেই বিস্তর কাজ থাকে সেদিন। তবু এই ঈদে চাচা-ফুপুরা এলে খুব আনন্দ হত। আমাদের বাড়িটা ছিল একটা মিলন মেলা। সব চাচা ফুপু মামারা বাড়ি বলতে আমাদের বাড়িই বুঝতেন। তুতো ভাইবোনদের কেউ কেউ বছর জুড়েই আমাদের বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করত বলে বাড়িতে সবসময় একটা আলাদা আনন্দ থাকতই। ছোট মামারাও আমাদের কাছাকাছি থাকতেন। সুতরাং কোন ঈদে অন্য চাচা ফুপু না এলেও মামাদের সাথে হৈহৈ করে দিব্যি কেটে যেত। দুটো পরিবারের কথা মনে না করলেই নয়। এদের বাড়ির দুই মহিলাকে আমরা পিসি সম্বোধন করতাম এবং এই দুই পিসিই বাবাকে নিজের দাদাই ভাবতেন। কত রোজার দিন গেছে যেসব দিনে পিসীরা টিফিনবাটি ভরে আমাদের জন্য ইফতার তৈরি করে এনেছেন। তেমনি পূজা সময় আমরা সবার আগে ওঁদের বাড়ি পৌঁছে গেছি।

পূজো আর মেলা

দুটো ঈদ ছাড়াও দুর্গাপূজোর সময়ও আমরা বেশ ঘুরে বেড়াতাম। বাবা গাড়ি করে আমাদের সবাইকে নিয়ে মন্ডপগুলো ঘুরে দেখাতেন। এ ছাড়া পিসিরাও ছিলেন ওদের বাড়িও যেতাম, লক্ষ্মী পূজোর নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছি। একটা বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে, সে বাড়ি মাসিমা খুব যত্ন করে আমাদের পূজোর খাবার খাওয়াতেন। ওর মধ্যে একটা সন্দেশের মত মিষ্টি থাকত যা মাসির হাতের তৈরি, চালের গুঁড়ো থেকে তৈরি করা এত অপূর্ব স্বাদের মিষ্টি আমি পরে আর কোনদিন খাইনি, কিন্তু স্বাদটা এখনো ভুলিনি।

ছোটবেলাতে বছরে একবার অষ্টমীর মেলা বলে একটা মেলা হত। ঐ দিন আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদে পূণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত থেকে নানা বয়সী লোক আসত। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে লোকের আসা যাওয়া দেখতে দেখতে মনটা কৌতুহলে চঞ্চল হয়ে উঠত। ইচ্ছে করত ওদের সাথে আমিও সেখানে যাই। সেদিনটা বেশীরভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মানুষই উপোস করতেন। বিকেলে সেই মেলা দেখতে যেতাম। চরকি, পুতুল নাচ, মাটির পুতুল, নানারকম খাজা গজা দিয়ে মেলা ভর্তি। খুব ভালো দা বঁটি, মাটির হাড়ি মিলত এ মেলাতে, তাই কমবেশী সবাই এ মেলা থেকে এসব জিনিস কিনতেন। আমি কিনতাম মাটির ঘোড়া,টমটম গাড়ি, মাটির ফলফলারি আর পুতুল। ঘোড়াটার গায়ে সাদার ওপর সোনালী দাগ টানা থাকত, রোদে নিলেই কেমন চিক্‌মিক্ করে উঠত। একটা

মাটির গোল চাকতির উপর দুটো কাঠি বসানো টমটম গাড়ির সামনেটা রশি বাঁধা। টানলেই কাঠিদুটো নড়েচড়ে উঠে চাকতির গায়ে পড়ে আর তাতে সুন্দর আওয়াজ করে উঠত। ওইরকম মাটির খেলনা কিনতে পেরেই আমার যা আনন্দ হত তা লিখে বোঝানো যাবে না। এই মেলা তিনদিন ধরে চলত আর এই মেলাতেই দূর থেকে তিনদিনের জন্য আসত বহুরূপী। ওরা বাড়ি এসে ওদের অভিনয় দেখিয়ে যেত। তিনদিনে তিনরকমের পোষাক, চেনার জো নেই এবং পৌঁছে গেটের অনেক আগে থেকেই মা'জি কাহা বলে যখন হাক দিত, সবার আগে দৌড়ে যেতাম আমি। হা করে ওদের অভিনয় দেখতাম, সংলাপ গিলতাম এবং তিনদিন পর ওরা যখন বকশিস নিয়ে বিদায় হয়ে যেত তখন আবার একবছর পর ওরা আসবে ভেবে আমার বুকটা খালি হয়ে যেত।

এই তো আমার উৎসব স্মৃতি থেকে উঠে আসা কিছু কিছু কথা যা আজ না লিখলে হয়ত চাপা পড়ে থাকত কোন অনড় পাথরের নীচে। কাছ থেকে দেখা বা দূর থেকে ভালবাসার সেসব স্মৃতির গায়ে গায়ে জন্মে যেত ঘাস। কোন এক দুপুরবেলা হয়ত হেলে পড়া এক নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে আমি মনে করবার চেষ্টা করতাম আমার যেন কি ছিল, কিন্ত এখন নেই। ভাবতাম কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারতাম না। একটা ঝলক দিয়েই ফের ডুবে যেত হয়ত,আজ লিখতে গিয়ে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠ'ল, স্থায়ী জায়গা করে নিল একটি লেখার মাধ্যমে।

সেবারের সেই পুজো এবং পনঞ্জু

সুশান্ত কর

১

সেবার বাবা এলেন একা। হঠাৎই। দিন কতক আগে চিঠি এলো তিনি আসছেন। এক ঝাঁপে ছ'ছটাকে পেছনে ফেলে হেই ই ই ই —ই করে একেবারে সপ্তম স্বর্গে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম ।

কতদিন... কত কত দিন ধরে স্বপ্ন দেখে গেছি, আমার সেই শৈশবের রাজপাটে আবারো গিয়ে পা রাখব। যে রাজপাটে আমি রাজা, পনঞ্জু মন্ত্রী। আমার নির্দেশ মানাই ছিল পনঞ্জুর কাজ । তার উপর আর কোনো কথা ছিল না । মাঝে মধ্যে তার পরামর্শও আমাকে মানতে হতো । তাই বলে মায়ের হাতের মার আর বাবার রাঙানো চোখকে ভয় পাওয়াটা কোনো কাজের কাজ ছিল না । সে আমাদের আইনে ছিল না । আমাদের রাজত্ব চলছিল নিরঙ্কুশ । দিনের পর দিন। পনঞ্জু আমার ছেলেবেলার প্রথম বন্ধু। আমার বাবার অফিসের বেয়ারা। অফিসটা যে কোয়ার্টারে থাকতাম তার উলটো দিকের পাহাড়ে । বাড়ি থেকে হাঁক পাড়লেই অফিসে শোনা যেত। পাহাড় বললে ভয় পাবার কিছু নেই। এখানেই আসলে পাহাড়টা মোড় ফিরেছে । মাঝের খাদটা ওখানে শুরু হয়েছে মাত্র । সেখানে আরেক বেয়ারার বাড়ি ছিল। যে আমাকে বিশেষ পাত্তা দিত না বলে নাম ভুলে গেছি ।

অফিসে কাজ থাকতো না বোধ হয় বিশেষ। কারণ পনঞ্জু প্রায়ই এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিত। আর আমি পাখি হয়ে যেতাম। কে জানত আমরা গেছি কোন পাহাড়ে, কোন অরণ্যে। বাবাদের অফিসের ঠিক উপর দিয়ে চলে গেছে যে পথ সেটি, তখন জানতাম, তুয়েনসাং গিয়ে থেমেছে। ওই পথ দিয়ে বাবা প্রায়ই জীপে করে চলে যেতেন। সেই পথের ওপারে এক বিশাল মাঠ ছিল, যেখানে প্রায় বিকেলে সামাতুরের ছেলেরা ফুটবল খেলত। তাতে আমার কোনো নিমন্ত্রণ থাকবার কথাও ছিল না, ছিলও না। বাড়ি থেকে কখনো তাকাতাম ওদিকে । সে ওই খেলা দেখব বলে নয়। যেদিন সেখানে কোনো খেলা হত না সেদিন প্রচুর ঘোড়া দৌড়ে বেড়াত । কখনো সন্ধ্যে হয়ে চাঁদ উঠে আসত। ঘোড়াগুলো তখনো চরে বেড়াতো । রাত বাড়লে ওরা চাঁদের দেশে বাড়ি চলে যেত । কিন্তু কোন পথে, তার কোনো চিহ্ন রেখে যেত না। গেলে নিশ্চিত, আমি আর পনঞ্জু পরদিনই ওখানে হানা দিতাম ।

সেই মাঠের বাঁয়েই ছিল এক পুলিশ ফাঁড়ি। তার উপরে এক বিশাল বাঁশের তোরণের ভেতরে সেনা বাহিনীর আড্ডা । ওই তোরণ পার করে একদিন নিয়ে গেছিল পনঞ্জু । সেখানে পথের দু'ধারে সারি সারি কাটা বাঁশের ফলা মাটিতে গাঁথা ছিল। পনঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলে সে বলেছিল, বড়রা যখন কোনো দুষ্টুমি করে তখন এখানে এনে শুইয়ে দেয়া হয়। সেই থেকে এই শরশয্যা আমার কাছে এক আতঙ্ক । ঠিক করেছিলাম, এমন কোনো দুষ্টুমি নিশ্চয়ই বড় হয়ে করব না যাতে এখানে এসে শুয়ে পড়তে হয়।

সেই থানার গেটেই এক অচেনা গাছে সবুজ সবুজ বেশ টক দেখতে ফল ফলত । পনঞ্জু করত কি, আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলত , পাড় । একদিন, মনে আছে, ঠিক ধরা পড়ে গেছিলাম। পুলিশ এসে বেশ গোঁফ পাকিয়ে কোমরে হাত বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাটা আমাদের রাজত্বকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছিল। পনঞ্জু ভয় পেত না, নির্বিকার আমাকে বলে যাচ্ছিল, তুই পাড়তে থাক। আর নিজে কী সব

কথা বলে বলে সেই পুলিশকে বশ করত। আমি তার মাথা মুণ্ডু ছাই কিছু বুঝতেই পারতাম না । সে বলত ওদের মাতৃভাষায়। বোধহয় বশ করত মন্ত্র পড়ে ।

ও নির্ঘাৎ প্রেম করত। বিয়ে থা করে নি । নইলে একদিন ...সেই যে বাবার অফিসের পশ্চিমে পুলিশ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে এক চিলতে পথটা চড়াই উৎরাই পার করে চলে গেছে এঁকে বেঁকে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কাজলা দীঘির ঘাট ছাড়িয়ে সেই লুকোনো আরণ্যক ঝরণাতে সেখানে একদিন আমাকে নিয়ে গেল কেন? ওখানে দল বেঁধে মেয়েরা ঝরণার নিচে স্নান করছিল। আমি ততক্ষণে ওর কাঁধে । ও বেরসিক, ওভাবেই ওদের সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছিল আর আমি হাঁ করে দেখছিলাম ! ওভাবেও লোকে স্নান করে বুঝি ! স্নানতো লোকে করে ঐ এক চিলতে কালো অন্ধকার ঘরে , যেমনটি আমরা করে থাকি । ওদের দু'একজন আমাকে নিয়েও টানা টানি করেনি যে তা নয়, কিন্তু আমাদের তখন কড়া নিয়ম ছিল যেখানেই যাই তার দাগ রাখা যাবে না। জলে নামলেও নামতে পারি, কিন্তু চুল ভেজানো না ।

সেই রাজপাট ছেড়ে আমি চলে এসছিলাম ৭২এর শরতে। শারদীয় দুর্গাপুজোর দিনকতক আগে । এসছিলাম করিমগঞ্জে মামার বাড়ি । সেবারেই আমার প্রথম পুজো দেখা । শিউলি ফুলে... থুড়ি...কচুরিপানার ফুলে ফুলে দোলে বেড়ানো । ভেসে কাটানো । কিন্তু আমি কি জানতাম যে সে রাজ আর রাজত্ব, সেই নিশ্চিন্দিপুর আমি পেছনে ফেলে এসছি চিরদিনের মতো? পনঞ্জু , প্রায়ই দেখতাম, মাকে মেঘের দিকে হাত তুলে দেখাতো আর বলত কোন মেঘে ওর কার বাড়ি। মাও আমার হার মানতেন না । তিনিও রোজ একটা দক্ষিণের মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখাতেন সেই পাহাড়ের ওদিকটাতেই তাঁর মায়ের বাড়ি । সে দেশের নাম পাকিস্তান । পরে জেনেছি, মায়েদের বাড়ি ছিল বটে পাকিস্তানে। কিন্তু তখনকার নতুন বাড়িটি আর সে পাকিস্তান নেই। পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে সে তখন ভারত বর্ষের এপ্রান্ত । সম্ভবত তাই তিনি তখনো তার দেশবাড়ির নাম বললেই বলতেন পাকিস্তান। আমি জানতাম সামাতুরের বাইরে আছে আরেক রূপ কথার দেশ। সে দেশের নাম পাকিস্তান। আর ওখানে একজনই মহিলা থাকেন । তিনি আমাদের মায়ের মা, দিদিমা । আমি চলে এসছিলাম সেই আশ্চর্য ভদ্রমহিলাকে দেখে যাব বলে।

কে জানত সেই ভদ্রমহিলা মন্ত্র জানেন? না ঠিক , তিনি ধরে রাখেন নি। কিন্তু রাখলেও রাখতে পারতেন। হয়েছিল এই, আমাকে স্কুলে ভিড়িয়ে দেবেন বলে বাবা সবাইকে নিয়ে এসে আমাদের শিলচরে ভাড়া করা বাড়িতে কাকাদের সঙ্গে রেখে নিজে ফিরে গেছিলেন একা। দু'বছর পর আমার বড় কাকার বিয়ে হলো, বাবা এসে মা আর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে চলে গেলেন। আমাকে রেখে গেলেন একা, নির্বাসনে। লেখাপড়ার শাস্তি বরাদ্দ করে ।

তারপর ওরা আসতেন প্রতি দুবছরে একবার মাসখানিকের জন্যে। সেদিনগুলোতে ছিল আমার মুক্তির দিন, ছুটির দিন, দিন উৎসবের। কিন্তু সেবার হঠাৎই বাবা একা এলেন। প্রথমমানের (এখনকার তৃতীয় শ্রেণি) পাঠশালাতে যে ছেলেকে নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন ঢুকিয়ে সেই আমি তখন সবে ক্লাস এইটের ষান্মাসিক দিয়েছি। বাবা এলেন আমাকে নিয়ে যেতে । এক মাস পুজোর ছুটি । সেই ছুটিতে আমি যাব সেই নিশ্চিন্দিপুরে । আমি কি পারি স্বর্গে পা না বাড়িয়ে?

সেই স্বর্গে পনঞ্জু ছিল না। বাবা ততদিনে বদলি হয়ে গেছেন কিফ্রিতে । এখন নাগাল্যান্ডের মায়ান্মার সীমান্তে এক স্বতন্ত্র জেলা শহর । সামাতুর থেকে বড়, দীর্ঘ আরো অপূর্ব সুন্দর এক শৈল শহর। কিন্তু , তখন তুয়েনসাঙের, মনে হয় ছিল, এক মহকুমা শহর। ওই তুয়েনসাং নামটা জুড়ে ছিল বলে মনের কোনে একটা আশা জেগেই ছিল পনঞ্জু কি আসবে না ,আমি এসছি জেনে? সে কি সত্যি ভুলে গেছে আমাকে ? কৈ, আমিতো তাঁকে ভুলিনি একটি দিনের জন্যেও। আমার চোখতো এখনো শরতের তুলো তুলে মেঘে খুঁজে বেড়ায় আমার সেই প্রথম প্রেম,

প্রথম বন্ধু পনঞ্জুকে। আমিতো আর ছিলাম না ‘কাবুলিওয়ালা’ মিনি । আমি সুশান্ত ।

অনেক অনেক দিন পর আবার চড়লাম পাহাড় লাইনের রেলে। মামার বাড়ি যেতে আসতে মাঝে বদরপুর ঘাটে বরাকনদীর উপর যে রেল সেতুটা পেরিয়ে যেত মাথার উপর দিয়ে সেই সেতু পার করে রেল চলে যায় পাহাড়ে । কত কত দিন এ পথ দিয়ে যেতে আসতে দিন গুনেছি কবে আসবে সেই দিন আবারো যেদিন আমি ওই সেতুর নিচে দিয়ে নয়, যাব উপর দিয়ে । নদী পেরিয়ে। আজ সেই দিন আবার এলো । সে আজ বহু বহু দিন আগের কথা । তেত্রিশটি শরৎ আগের কথা । সন ১৯৭৮-এর গল্প । কেউ শুনবেন?

২

লামডিঙে ট্রেন পালটে পরদিন ভোরের অল্প আগে ডিমাপুরে পৌঁছুলাম। এলাম, আর একটা গাড়ি চেপে কিফ্রি রওয়ানা দিলাম —ব্যাপারটা ওরকম ছিল না মোটেও। সেখানে একটা হোটেলে উঠতে হলো ।

ভেতরে যাবার ইনার লাইন পারমিট এই শহরেই মেলে। সেটি আগে জোগাড় যন্ত্র করতে হয়। মনে হয় না, বাবার সে সমস্যা ছিল। তাঁর স্থায়ী অনুমতিপত্র ছিল। কিন্তু কথা হলো পরের গাড়ি পেলে তবেতো? এখানে বসে থাকতে হবে, বাজারের জিনিসপত্র নিয়ে যদি কোনো ট্রাক কিফ্রি যায় আর সামনের ওই তিনচারটে আসন খালি থাকে তবে তাতে চড়া যাবে। নাগাপাহাড়ের পথে পথে তখন আজকের মতো না বাস ছিল, না টেক্সি।

তাই কিফ্রি থেকে সাধারণত লোক তখনই বাইরে যেত যখন ওরকম গাড়িঘোড়ার সংখ্যা বেড়ে যেত। পুজোর সময় সেরকম গাড়ির সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বেড়ে যেত। প্রথমদিন বাবা গোটা দিন ঘুরে কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নি । বিকেলে আমরা এমনি এমনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালাম। প্রথমবারের মতো ডিমাপুর শহরটা ঘুরে দেখলাম। শিলচরের মতোই বড়ো শহর, লোকে বলে নাগাল্যান্ডের অর্থনৈতিক রাজধানী। সে রাজ্যের একমাত্র সমতল শহর। আমাকে একা রেখেই সকালে বাবা বেরুতেন গাড়ির খোঁজে, পরদিন দুপুরে এসে জানালেন তার পরদিন বিকেলে একটা গাড়ি যাবে বাজারের কিছু জিনিসপত্র নিয়ে। সঙ্গে যাবে কিফ্রির একমাত্র পুজোর প্রতিমা ।

প্রতিমা আমাদের সঙ্গে যাবে শুনে আমার এখনো মনে আছে, প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দু’রকম। মনে হচ্ছিল আমাদের উপরেই বোধহয় দায়িত্ব পড়ল সেই প্রতিমা নিয়ে যাবার। এভাবে সেই পুজোর সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেলাম। আবারো মন খারাপ হয়ে গেল। কেননা শিলচরে আমাদের পাশের বাড়িতে ঘটা করে পুজো হতো । বাড়ির পুজো, কিন্তু তাতে পাড়ার সবার অবারিত দ্বার ছিল। সে পুজোতে মুর্তি আমাদের চোখের সামনে তৈরি হতো । শ্রাবণ মাসে শিল্পী এসে কাঠামো তৈরি করে মাটির প্রথম পোঁচটা দিয়ে চলে যেতেন করিমগঞ্জে। যেখানে তাঁর বাড়ি । শিলচরের আগে করিমগঞ্জের পুজো আর শিল্পীদের কদর ছিল বেশি । দিন কতক পর সম্ভবত পুরো ভাদ্র পার করে এসে তিনি সেই কাঠামোতে আরেকপোচ মাটি চড়াতেন, সাদা কাপড়ে মোড়তেন, তার উপর আবারো মাটি।সেই মাটি শুকোলে সাদা রঙ। এমনি করে আমরা আমাদের চোখের সামনে দুর্গার হয়ে উঠা দেখতাম। ফলে সেই প্রতিমা যখন বিসর্জনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হতো, আমার মনে হতো সত্যি সত্যি দুর্গা না যাবার বায়না ধরেছেন। আর লোকগুলো জোর করে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুলে দিচ্ছে ।

কিফ্রির মূর্তি যখন আমাদের ট্রাকের পেছনে তোলা হলো, তখন মনে হলো ইনি একেবারেই ফেলনা। তাঁর কোনো কদর নেই। মূর্তি নিয়ে যেতে এসছিলেন রঞ্জিৎ কাকু । ট্রাকেই আলাপ। পরে পরে জেনেছিলাম ইনি হচ্ছেন সেখানকার সেই লোক যাকে নইলে কারো চলে না । মূর্তি আনো ...রঞ্জিৎ, পেন্ডেল সাজাও ...রঞ্জিৎ, হ্যাজাক জ্বালাও ... রঞ্জিৎ, কারো বাড়িতে জল আসছে না রঞ্জিৎ, কারো ঘরের চালে ফুটো রঞ্জিৎ, কারো বাড়ি বদল করা চাই রঞ্জিৎ... । ইনি সর্ব ঘটের কাঠালি কলা, ডাক পেলেই হলো, বৌদি...ই... বলে হাঁক পেড়ে গিয়ে হাজির। আগে এ বাড়ি ওবাড়ির সুখ দুঃখের খবর জানাবেন, এক আধটু হাসির হুলোড় জমাবেন , দু'এককাপ চা চেয়ে খেয়ে নেবেন। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, ডেকেছিলে কেন, বল?

গোটা পথে দেখছিলাম ট্রাক চালাচ্ছিল ড্রাইভার, কিন্তু সেই ড্রাইভারকে চালাচ্ছিলেন রঞ্জিৎ কাকু। আমাকে নিয়ে যখন বাবা পেছনে সিটে বসেছিলেন, রঞ্জিৎ কাকু টেনে নিয়েছিলেন সামনের একটিমাত্র সিটে যাতে আমি সেখান থেকে গোটা পথ দেখে দেখে যেতে পারি। পাহাড়ি পথে আমি পরে অজস্র বার ঘুরে বেড়িয়েছি । পাহাড় অতিক্রম না করে আমরা শিলচরের লোকেরা পৃথিবীর কোথাও যেতে পারি না । জোয়াই শিলঙের মতো সুন্দর পথ আমি পূর্বভারতে আর কোথাও দেখিনি, গ্যাংটক দার্জিলিঙেও না। কারণ শিলং রয়েছে মেঘালয়ের মালভূমির উপর। বাংলা ছায়াছবিগুলো এই পথের পাশে এসে সুটিং করলে সুইজারল্যান্ড যাবার ব্যয় বাঁচাতে পারত। রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন এই শহরকে ।তাই তাঁর সবচে' রোমান্টিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা' লিখেছিলেন এই শহরকেই সম্মান জানাতে। এরা শিলং অব্দি এসছে অনেকবার কিন্তু তার দক্ষিণে যাবার সুবুদ্ধি আজো হয়েছে বলে দেখিনি। দেখলে দার্জিলিঙ নিয়ে বাঙালির অহঙ্কার সেই কবেই ফুরিয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন এই শহরকে । তাই তাঁর সবচে' রোমান্টিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা' লিখেছিলেন এই শহরকেই সম্মান জানাতে।

নাগাল্যান্ডের পথে পথে পাইন বন ছড়ানো থাকলেও সৌন্দর্যে সে শিলঙের ধারে কাছেও যায় না। কিন্তু বিশাল উঁচু... যার সামনে আমার মেঘালয় কিম্বা উত্তরকাছাড়ের পাহাড়গুলোকে মনে হয় নিতান্তই 'বাওনা' । দূর দূর পাহাড়ের অন্ধকার গায়ে গায়ে যেন এখানে ওখানে নক্ষত্রের মেলা বসেছে। রঞ্জিৎ কাকু, বলে যাচ্ছিল কোনটা কোন শহর। কোনটা দিয়ে আমরা যাব আর কোনটাকে আমরা এড়িয়ে যাব। ওই কাছ থেকে যে শহরটিকে দেখা যাচ্ছিল সেখানে আসতে যখন ট্রাকের কয়েক ঘন্টা লেগে যাচ্ছিল, আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। দু'চোখের পাতা এক করা কষ্টকর হচ্ছিল।

মাঝরাতে ওরা ঠিক করলেন একজায়গাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘুমোবেন। ঘুমোবেন মানে, ড্রাইভার আর ওর সঙ্গী চলে গেল ট্রাকের পেছনে। পথের উপরেই শুবে বলে । আমরা ভেতরে শুলাম আয়েস করে তা কিন্তু নয়। হাত পা মেলে শোবার কোনো উপায় ছিলই না । ব্যাপারটা আমার মোটেও পোষালো না । এই আকস্মিক রসভঙ্গের জন্যে আমি মোটেও তৈরি ছিলাম না । আরেকটা কথাতো বলাই হয় নি, এই আরণ্যক পথের মাঝে শুয়ে পড়ে হাওয়া খাবার ঋতু সেটি মোটেও ছিল না। হাড়ে ততক্ষণে একটু একটু করে ঘাস গজাতে শুরু করেছিল। আমার এখনো মনে আছে, গাড়িটা আসছিল গদাই লস্করি চালে। সেটি ফেরার পথে নিজের অভিজ্ঞতার থেকেই বুঝতে পেরেছি । কিন্তু তখন আঁচ করছিলাম বাবা আর রঞ্জিৎ কাকুর উদ্বেগ দেখে । সেদিনি সন্ধ্যেতে মহাষষ্ঠী, আর আমরা দাঁড়িয়ে তখনো বহু বহু দূর। বাবা বলছিলেন, আর গাড়ি পেলে না? রঞ্জিৎ কাকু বলছিলেন পুজোর সময় এর চে' ভালো উপায় ছিল না। আমার তাতে কিছু যাচ্ছিল না, আসছিল না। রাতের অন্ধকারেই যে পথের বেশিটা পার করিনি সেই আমার সৌভাগ্য । এই পথ আমি আগে দেখিও নি, আর দেখলেই বা কী? এই পথ আমার জন্মভূমির পথ। তাকে দেখবার মোহটাই যে আলাদা ! সকাল বেলা এক ছোট্ট শহরে এসে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

যতদূর মনে পড়ছে সে শহরের নাম ফেক, এখন এক জেলা শহর। আমরা সেখানে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে রোদ পোহায়ে হাড়ের গজানো ঘাসগুলোকে ঘুম পাড়ালাম। বাঁদিকে যে পথটা উপরের দিকে উঠে গেছিল সে পথে কিচ্ছুটি দেখার উপায় ছিল না । বাবা বলছিলেন একেই বুঝি মেঘ বলে! আর কী আশ্চর্য ডানদিকে যে পথটা নিচে নেমে গেছিল সেই পথে আলো ঝলমল সূর্য নেমে এসছে। লাল নীল পরি, গন্ধর্বরা খেলে বেড়াচ্ছে। কেউ উঠে আসছে, কেউ মেনে গিয়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিৎ আজকাল ইন্টার নেটের ছবি ট্যাগ করবার যুগে সেই দৃশ্য খুবই সাধারণ মনে হলেও আমাদের ছেলেবেলা সেই ছবি দেখিয়ে কাউকে উন্মনা করে দেবার জন্যে যথেষ্ট ছিল ।

এক সময় মেঘের বুক চিরে আমাদের গাড়ি এগুতে শুরু করেছিল। এমন মেঘের বুক চিরে এগুবার উত্তেজনার রঙই আলাদা । আমার মনে আছে, এই মাত্র ক’বছর আগে সস্ত্রীক আরো কিছু আত্মীয় আত্মীয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন চেরাপুঞ্জির পথে যাচ্ছিলাম আমরা একটা খেলা শুরু করেছিলাম । কেউ বলল, এই ই...ই...ই...ই...ই গেল! অন্য জন বলল, এই...ই...ই...ই এলো! যদি মেঘ মিলিয়ে না গেল, কিম্বা রোদ চলে না এলো তবে যে কথাটা বলল সে গেল ...হেরে । এমন রৌদ্রমেঘের খেলা আমি তখন একাই উপভোগ করছিলাম। আমার সেই আনন্দে রঞ্জিৎ কাকু অল্প অল্প গা ভাসাচ্ছিলেন। বাবা আমার চাপা মানুষ, চুপ করে হাসছিলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না সে খেলা। খানিক পরেই ঝলমলে রোদ আর পথের উৎকন্ঠা সবার ঘাম বের করে এনেছিল। মাঝে মাঝে একেকটা ঝরণা চোখে পড়লেই ইচ্ছে হচ্ছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীর শীতল করি । সেই সৌভাগ্যও যে হতেই পারে অতোটা আমি ভাবিই নি । দুপুরে গাড়ি এক ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লে দেখি সবাই কনডাক্টার গাড়ির ইঞ্জিনে জল দিল। ড্রাইভার আর রঞ্জিত কাকু প্রায় জন্মদিনের পোষাকে সেই ঝরনাতে জল হয়ে গেল। আমারও ইচ্ছে করছিল বটে, কিন্তু বাবা সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। যদি নতুন জলে এই পুজোর দিনগুলোতে জ্বর চড়ে তবে মায়ের কাছে বাবার নিস্তার ছিল না । কিন্তু, আমিও একটু চেপে ধরতেই হাঁটু অব্দি পা ভেজাবার অনুমতি পাওয়া গেছিল। একটু পরে দেখি বাবাও সে জলে পা ভেজাতে শুরু করেছেন।

সন্ধ্যে হতেই আমারো মনে হচ্ছিল, পথটা সত্যি বড় দীর্ঘ হয়ে গেছে। রাত প্রায় নটায় দ্বিতল বাড়ির নিচের তলার খোলা দরজা দিয়ে লণ্ঠনের যে আলোর রেখা পথ দেখাচ্ছিল এখনো মনে পড়লে সে রেখাগুলো আমার চোখ এলোমেলো করে দেয়। মা! বলে ডাকতে আমার লজ্জা করছিল। মিতু...উ...উ...উ..., ... আমার বোনের নাম ধরে জোরে ডাক দিতেই রাতের পাখিরা ডানা ঝাপটে এসে আমার গায়ে পড়ল। ছোঁ মেরে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাবা কোথায় পড়ে রইলেন আমি ফিরেও তাকাই নি।

৩

পরদিন সেই ভোর থেকেই দেখি আমাদের বাড়িতে দৌড় ঝাঁপের শেষ নেই। এক জন আসছেন তো আরজন যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ আবার, “কৈ গো আপনার বড় পোলা? আইছে বুলে?” জিজ্ঞেস করতে করতে বিছানা ঘরেও উঁকি দিচ্ছিলেন। না না, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই আমি এক কেউ কেটা গেছি বলে তারা সবাই আমাকে দেখতে আসছেন। আসলে আমাদের কোয়ার্টার বাড়িটা ছিল শহরের অনেকটা মাঝামাঝি ।

এই রে, মাঝমাঝি বললে কী বোঝা যাবে? তার মানে এই নয় যে এখানেই সব বাজার হাট, অফিস আদালত, হাসপাতাল , পোস্ট আপিস। পুরো শহরটি প্রায় মাইল তিনেক লম্বা । যেপথে আমরা এসে শহরে ঢুকেছিলাম সেটি

উপরে উঠে সোজা চলে গেছে তুয়েনসাং । সেখানেই এক জায়গায় ডানদিকে একটু উপরের দিকে মোড় নিয়ে আবার পেছন দিকে সমান্তরালে আরেকটা পথ চলে এসছে শহরের প্রবেশ পথের সমান্তরালে উপরে । সেই পথ মাইল দু-এক গিয়ে মিলেছে কিফ্রির লয়লা স্কুলের মাঠে। সেই স্কুলে আমার ভাই বোনেরা পড়ত। ঐ উপরের পথের মাঝামাঝি আমাদের বাড়ি । সেই অর্থে আমাদের বাড়িটা শহরের মাঝামাঝি । সুতরাং স্কুলের দিকথেকে যারাই পুজোমন্ডপের দিকে এগুচ্ছিলেন তারা অতটা পথ একা এগুবার পথে সঙ্গী জোটাতে এসে আমাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছিলেন।

নিচের সেই তুয়েনসাং পথের মোড়ের কাছেই পুজোর মন্ডপ। ওখানেই শহরের ছোট্ট বাজার হাট। এর থেকে উপরে চড়লে শহরটা আর বেশি দূর এগোয় নি। লোকজনের বসতবাড়ি মূলত আমাদের দিকটাতেই। অফিস আদালত সব গোটা শহরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এখানে ছড়ানো ছিটোনো। সব ক'টা পথের কাছে কাছেও নয়।

কিফ্রির বাজার হাট বললেও বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না। সামাতুরে আমরা দেখতাম মাঝে মধ্যে হেলিকপটার এসে বাবাদের অফিসের উপরের মাঠের এক প্রান্তে 'ড্রপিং' করে যেত। সেগুলোই যে দু'একটা দোকান পাট ছিল ওদের পসারের জিনিস পত্তর । সে 'ড্রপিং' থেকেই আমাদের ঘরে চাল ডাল পাওয়া যেত। মানে দোকানির থেকে কেনা যেত। শাক সবজি প্রায় সবাই বাড়িতে ফলাতো । আমাদের বাড়ির সামনে এক বড় ফুলের বাগান যেমন ছিল, পেছনটার তেমনি ছিল সবজি খেত। নিজেদের গরু ছিল বেশ কিছু, ছাগলও ছিল। আর ছিল প্রচুর মুরগি। পরে যখন শিলচরে এসে বাবা বাড়ি করেন, সেখানেও গরু ছাগল পোষতে না পারলেও আমরা বেশ কিছুদিন মুরগি পোষার চেষ্টা করেছিলাম। মাছ পাওয়া যেত না। একবার মনে আছে, বাবা তুয়েনসাং থেকে এক বড় তেলের টিনে প্যাক করা জ্যান্ত মাগুর মাছ কিনে নিয়ে গেছিলেন। সেই মাছ আমরা অনেকদিন ধরে খেয়েছিলাম। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ছিল। নইলে আমরাতো শুধু জানতাম ছোট টিনের কৌটার মাছ। যেগুলো 'ড্রপিঙে' আসত। এখনো, এই তিনসুকিয়াতে সার্ডিন' মাছের কৌটা পাওয়া যায় বলে আমি মাসের বাজারের এক কৌটো অবশ্যই নিয়ে আসি।

কিফ্রিতে সামাতুরের থেকে অবস্থা খানিকটা ভালো ছিল। এখানে 'ড্রপিং' নেই। সপ্তাহে দু'একটা গাড়ি আসত সব্জি মাছ ইত্যাদি নিয়ে। থামত আমাদের বাড়ির কাছেই উপরের রাস্তাতে। হয়তো অন্যত্রও অন্য গাড়ি থামত। আমি তত নিশ্চিত নই। লোকের জানাই থাকত কবে গাড়ি আসবে। কারণ, ওটাইতো নিত্যদিনের ব্রেকিং নিউজ ---খুড়ি বিশেষ বিশেষ খবর ছিল। ব্যস , মুহূর্তে ওইখানেই সব ছু! মন্তর!

তবু স্কোয়াস, লঙ্কা, গাজর, ফুল কপি, বাঁধা কপির গাছ লাগাবার স্বভাবটা কেউ ছাড়েনি। বিপদতো লেগেই থাকত। ফুলের গাছে বাড়ির চারপাশটা অবশ্যই সাজাতো সবাই। শখে নয় ততটা। যতটা বাড়ির ঠাকুর দেবার দরকারে । শখের গাছ ছিল ডালিয়া। আরো দু'একটা পাহাড়ি ফুল ছিল। সেগুলোর নাম আজ আর আমি মনে করতে পারি না । ডালিয়া পারি, এর থেকে সহজে চোখ ফেরানো মুস্কিল। কত বিচিত্র রঙ আর কত বিচিত্র বাহার।

যেভাবে লোক আসছিল, আমাদের সঙ্গে নিয়ে পুজো দেখতে যাবে বলে তাতে এ ক'দিনের টানা যাত্রার ধকলের পরেও বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা মুস্কিল ছিল । বুঝতে পারছিলাম এ শুধু পুজো দেখতে যাওয়া নয়, পুজো করতে যাওয়া। সবাই গেলে তবেই না ওখানকার কাজগুলো সব হয়ে উঠবে সময় মতো। ওদের কথা থেকেই বুঝতে পারছিলাম, এ আমার শিলচরের পাশের বাড়ির পুজো নয়। এ হলোগে এক্কেবারে নিজেদের বাড়ির পুজো। এই যে পরের বাড়ির থেকে নিজেদের পুজোতে অবস্থানের পাল্টে যাওয়া তার অনুভূতিটাই ছিল অন্যরকম। পাশের

বাড়ির পুজোর প্রতিটি দিনের সঙ্গী থেকেও সেই ছেলেবেলাই আঁচ করাতাম কোথায় যেন কিসের একটা অভাব রয়েছে। দেবী আমাদের বন্ধুবান্ধবদের চোখের সামনেই হয়ে উঠতেন মানেতো তাঁকে আমরাই গড়ে তুলতাম। তারপরেও যেন তিনি আমাদের হয়ে উঠতেন না । পুজোর মূল আয়োজনে আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো মূল্যই ছিল না । আর পুজোর দিন কয়টিতে সে বাড়ির আত্মীয়রা অন্য শহর বা গ্রাম থেকে এসে যেভাবে হম্বি-তম্বি শুরু করতেন সেটি ছিল একেবারেই অসহ্য আর অপমানকর। বোধকরি জমিদারবাড়িগুলোতে সেরকম অপমানের জবাব দিতেই একসময় দুর্গা পুজোর গণতান্ত্রিকীকরণ হয়ে গেছিল। পুজো হয়ে গেছিল বারোয়ারি। ছোট্ট করে আর পরোক্ষে হলেও আমি সেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে গেছিলাম যেন। সুতরাং আমিতো সে পুজোতে যাবই । আরো আগেই যাব। ভাবখানা এই যেন... আমায় নইলে... তোমার প্রেম হতো যে মিছে।

বোন ভাইয়েরাও বলে রেখেছে, সাত সকালে উঠতে হবে। পুজো মন্ডপে যেতে হবে। কিন্তু আমার আরো কিছু কাজ ছিল। দেখবার ছিল যদি শহরটা সামাতুর হয়, যদি বেরিয়েই দেখি পনঙ্কু আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমিতো আর পুজো দেখতে আসিনি। সে কি আর কম দেখেছি! এসছি সামাতুরের জন্যে, পনঙ্কুর জন্যে। বাবাকে পথে পথে বলেও এসছি, আমাকে সামাতুর নিয়ে যেতে হবে। বাবা বলেছিলেন, ‘হবে। যদি গাড়ি পাওয়া যায়।‘ কিন্তু তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি সামাতুরের অনেকেই এখন এখানে এই কিফ্রিতে আছেন। আর পনঙ্কু, সাকিবারাও মাঝে মাঝেই এখানে এসে থাকে। সে তথ্য বাবা কিছু না ভেবেই দিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু দিয়ে আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

যেমন নতুন প্রেমিকেরা সব মেয়েতে তার প্রেমিকার মুখ খুঁজে ফেরে পথে নেমেই আমি নাগা পুরুষ দেখলেই তার চেহারাটাকে মেলাবার চেষ্টা করতে শুরু করলাম পনঙ্কুর সাথে। স্নান সকালের দুধ রুটি মুখে দিতেই মা নতুন জামা বের করে দিলেন। সার্টটা তিনিই নিজেই বহু বহুদিন পর আমার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। সেটি গায়ে মানিয়েছে কি না অনেক ক্ষন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। না জানি, কত দিন ধরে এই মুহূর্তটির জন্যে তিনি সময় গুনছিলেন। বাড়িতে আসা একদল নারী পুরুষ আর আমাদেরই বয়সের তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি আর বোন মিতু সেই সকালে মন্ডপের পথে পা বাড়ালাম। মা-বাবা ছোট ভাইটিকে নিয়ে আসবেন পরে। মূল পথটা ছেড়ে একটা ফাঁড়ি পথে চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে আমাদের দলটি মন্ডপের দিকে এগুচ্ছিল আর বোন আমার গাইডের কাজ সামাল দিচ্ছিল। সে শুধু পথ দেখাচ্ছিল না । আমাকে পথের পরে প্রতিটা ঘর, অফিস, গাছ, পাখি, পারলে পতঙ্গের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে পথ হাঁটছিল। এমনকি কোথায় পা ফেলতে হবে কোথায় নয় সেই নির্দেশও দিতে দিতে এগুচ্ছিল। পাছে, তার সমতলের অনভিজ্ঞ ভাইটি পা পিছলে খাদে পড়ে যায়!

একটাই পুজো পুরো শহরে। করেন মুলত বাঙালিরা হিন্দুরা । কিন্তু এ ছাড়াও ছিলেন কিছু অসমিয়া, বিহারি, নেপালি মানুষ। তারা সব্বাই নাগাল্যান্ডের বাইরের লোক, বাঙালিদের বেশিরভাগই অসমের অবিভক্ত কাছাড় জেলার লোক। তারা ওখানে আছেন আমাদের পরিবারটিরই মতো সরকারি চাকরি করেন বলে, ছোটখাটো ব্যবসা করেন বলে কিম্বা করেন হাতের কাজ । বছরের ঐ একটা সময় ওরা বাড়ি না যেতে পারার দুঃখ ভুলেন ঐ পুজোতে। সেই সকালে সবাই গিয়ে জড়ো হবে। নিজেরাই হাত লাগিয়ে এটা ওটা সম্পন্ন করবে। হাসবে, মস্করা করবে, পরনিন্দা পরচর্চা করবে। আবার সময় হলে, ‘বাদলটা প্রসাদ না নিয়ে কোথায় চলে গেল, বলতো!’, ‘নবীন এটা কী করল , ওর বৌকে না নিয়ে চলে এলো!’, ‘ এই দাস বৌদিকে দিয়ে যদি একটা কাজও ভালো করে হয়!’ বলে কিফ্রিতুতো দিদি, বৌদিরা অনুযোগের ঝড়ও ছোটাবেন। ভট্টাচার্য জেঠু হয়তো, ততক্ষণে গর্জন করে গোটা মণ্ডপ মাথায় তুলে বলবেন, “রায়কে আমি বললাম ওর অফিস থেকে এক দশটা টিন জোগাড় করে দিতে, না বাবু পারবেন না! বাবুর

মান খসে যাবে অফিসারকে বলতে! বেটা আসবিতো দুপুর বেলা । তোর ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেব। ” আর বেশিদূর যাব কেন, আমার মাকেই দেখলাম কতমানুষকে তেমন শাসন করছেন। উনি শাসন করতে চিরদিনই ভালো বাসেন। তাঁকে নইলে কারো চলছিল না, কিন্তু তাঁর নিন্দুকের সংখ্যাও কম ছিল না। সে নিন্দুকের দলে যে মাঝে মধ্যে আমিও ভিড়ে যাই নি তাও সত্য নয়। দিনের দুবেলা সবার খাবার পাত পড়ত মণ্ডপে । যদিও অনেকেই বাড়িতে খেয়ে দেয়েও আসত। দুপুর গড়ালে কেউ কেউ খানিকক্ষণের জন্যে বাড়ি গেলেও সন্ধ্যে হবার আগেই আবার ভিড় বেড়ে উঠত। চারদিকে গোল করে চেয়ারে বসে আড্ড জমাতো যে যার মতো । এক কোনে হয়ত দেখা গেল কেউ গেয়ে উঠছেন আগমনির গান, কেউ শ্যামা সঙ্গীত, কেউ বাউল গান তো, কেউ সরাসরি হেমন্ত মান্না দে কিম্বা কিশোর কুমার । কারো গলা বাঁকা তো কারো বা ভাঙ্গা। কিন্তু তাতে কারো রসগ্রহণে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না । অন্য কোনে তখন কেউ কৌতুক শুনিয়ে আড্ডা জমিয়ে রেখেছেন। আমি তখন খুব ভালো বাথরুম সিঙ্গার ছিলাম। রেডিওতে যে গান শুনতাম তাই পথে ঘাটে গুনগুনিয়ে গায়ক হবার স্বপ্নে দিন কাটাতাম। সে গানগুলোর বেশির ভাগই ছিল শিলচর কিম্বা ঢাকা সিলেটের রেডিও স্টেশনের সম্প্রচারিত বাঙলা আধুনিক কিম্বা ছায়াছবির গান। হিন্দি গান যে শুনতামনা তা নয়, কিন্তু সেকালে আমার এক ভ্রান্ত বোধ গড়ে উঠেছিল যে হিন্দি গান করে বাজে ছেলেরা। রকে বসে আড্ডা দেয়াই যাদের জীবনের লক্ষ্য। আমার কাকিমা রোজ সকালে শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে পুজো দিতেন আর আমাদের ঘুম ভাঙাতেন। আমি সেগুলোর অনেকটাই শিখে ফেলেছিলাম। সেগুলো গেয়ে আমিও আসর জমিয়ে দিয়েছিলাম, বললে আমার আজকালকার অনেক বন্ধু বিশ্বাসই করবে না। আজো আমি প্রাণ ভরে গান শুনি , সেকালের গানগুলো আমার এখনো এতো প্রিয় যে তার প্রায় সবকিছুই আমার সংগ্রহে রয়েছে। কিন্তু যেগুলো সম্ভবত ভারতে খুব কম লোকের সংগ্রহে রয়েছে সে হলো, বাংলাদেশের সাবিনা ইয়াসমিন, সুবীর নন্দী, এন্ড্রো কিশোর, ফিরদৌসী রহমানদের গান। আজ সিডি ইন্টারনেটের যুগে আমার সেই পুরোনো প্রেমকে যে আবারো এভাবে এতো করে কাছে পেয়ে যাব বহুদিন তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সাবিনা আমার সবচে’ প্রিয় শিল্পীদের একজন । লতা মুঙ্গেসকরও আমাকে ততো মুগ্ধ করতে পারে না। কিন্তু কলেজ জীবনে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমার দ্বারা গায়ক হবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি যে গুনগুন করা ছেড়েছি, তাই নয়, এখন আর আমি কোনো গানের একটি কলিও মনে রাখতে পারি না। এ এক অদ্ভূত মানসিক অবস্থান। শুধুই মনে হয় কী হবে মনে রেখে? অথচ এই লেখা যখন তৈরি করছি তখনো আমার কম্প্যুটারে বাজছেন সুবীর নন্দী। গান না শুনে আমি কোন দিন কোনো লেখা পড়ার কাজ করতেই পারিনি ।

দশমীর বিকেলে দুর্গা আবারো ট্রাকে চড়লেন। পেছনে গোটা শহরের যত জীপ রয়েছে, সংখ্যাটা আমার মনে আছে আঠারোটা, সেগুলোর এক দীর্ঘ লাইন। গোটা শহর তাতে চড়ে বসেছে। বিকেলের আকাশ লাল হয়ে আসতেই সূর্যের সঙ্গে করে সমতলের কোলাহল থেকে বহু বহু দূরে একা এক কিফ্রি শহরের দুর্গার শুরু হলো দীর্ঘ বিদায় যাত্রা। কাছে পিঠে কোনো নদী ছিল না । অথবা কাছেই ছিল, কিন্তু এতো বিশাল উঁচু পাহাড়ের নিচে নামাটাইতো ঘন্টা কয়েকের যাত্রা। শরতের শুক্লা পক্ষ। এখানে ওখানে তুলো তুলো মেঘে সাজানো স্পষ্ট আকাশ । গোটা পাহাড় একসময় জ্যোৎস্নাতে ঝলমল করে উঠল। সে রাতের জ্যোৎস্নার রঙ সম্ভবত কোনদিনই ভোলা যাবে না । কারণ ওমন বিসর্জনের যাত্রার অভিজ্ঞতাও আর কোনো দিন হয়ে উঠবে না।

ঝিঁঝিঁ পোকার সাম্রাজ্যে সেদিন হানা দিয়েছিল সেই গান , “ মারে ভাসাইয়া জলে কী ধন লইয়া যাইমু ঘরে...।” পরে জেনেছি, সে আমাদের সিলেট-কাছাড় অঞ্চলের এক জনপ্রিয় লোক গান। কিন্তু শিলরেতো সেটি শুনিনি কখনো। ওখানেতো চলে বিসর্জনের মহামিছিলে চলে ‘দম মারো দম... হরে কৃষ্ণ হরে রাম...” এখন সম্ভবত বাংলাব্যান্ড ‘দোহারে’র শিল্পীরা বিশ্বময় ঐ গানটিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বছর কয় আগে যখন কালিকারা তখনো তেমন নাম করেনি, টিভিতে দেখছিলাম ওরা ঐ গানটি কলকাতার কোনো বিসর্জনের ঘাটে বসে

গাইছিল। কিফ্রির মানুষগুলো যখন গাইছিল , “ মারে ভাসাইয়া জলে...।” তখন কি আর ওরা শুধু দুর্গার কথা মনে রেখেই গাইছিল? দেশের বাড়িতে পড়ে থাকা বৃদ্ধা মায়েদের কথা, বাবাদের কথা --- সেই ভাইয়েদের কথা , বোনেদের কথা ভেবে কি তাদের চোখ থেকে দু’এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়েনি যাদের তারা মুখ দেখেন নি বহু বহু দিন। যাদের জন্য হয়তো এবারেও পুজোতে দুটো জামা কেনবার পয়সা পাঠাতে পারে নি, আর পারলেও তারা যে সময় মতো সেটি হাতে পেয়েছেন তার কোনো নিশ্চিতি নেই। আমি জানি, এরা সব্বাই বাড়িতে খাম, পোস্ট কার্ড কিনে এনে রেখেছেন। আর বিসর্জনের ঘাট থেকে ফিরেই রাতে নতুবা পরদিন সকালে সব্বাই বসে যাবেন আলাদা আলাদা করে বাড়িতে চিঠি লিখতে। সেদিন দুপুরে পোস্টাপিসে সব্বাই আবার মুখোমুখী হবেন, বাড়িতে চিঠি পাঠাতে। “কত চিঠি লেখে লোকে-কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।” প্রতিবার পুজোর পর আমি নিজেও যে নিজের চিঠিটা পোস্ট করবার পর থেকেই দিন গুনে থাকি কবে আসবে এক গুচ্ছ চিঠি। শুধু আমারই জন্যে। এবারেই শুধু তার ব্যতিক্রম হবে।

আঠারোটা গাড়ি যখন এক সঙ্গে পথ চলে তখন একটানা চলে না কখনো, এখানে ওখানে থামতে থামতে হৈহোল্লোড় করতে করতে দু’ঘন্টার পথ পাঁচ ঘন্টায় পার করে দশমীর চাঁদ যখন ওনেকটাই মাথার উপরে উঠে এসছে তখন গাড়ি এসে থামল এক পাহাড়ি সেতুর পার করে। গাড়ি থেকে যখন নেমে সবাই জড়ো হলাম তখনকারমতো কোনো অভিজ্ঞাতকে মনে রেখেই কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে বসন্তের এই মাতাল সমীরণে” যে ভদ্রমহিলাটি , “আমার এ ঘর বহু যতন করে /ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে/আমারে যে জাগতে হবে/কি জানি সে আসবে কবে...” এই বলে বনে গেল না তার মাথায় ছিট ছিল। বনে যারা গেছিল তারা মাতাল ছিল বটে, কিন্তু ততোটা নয় যতটা হলে মেয়েদের আর বাচ্চাদেরো পাহাড়ের খাদ বেয়ে নিচে জলের কাছে নামতে দিতে পারে। সুতরাং আমরা রইলাম উপরে । বড়দের কেউ কেউ আমাদের সঙ্গ দিলেন। বাকিরা একচালা মূর্তি নিয়ে মুহূর্তে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেলেন। আমরা শুধু শুনতে পারছিলাম দূর থেকে ‘দুর্গা মাইকি জয়!” কোথায় গেলেন , কী করলেন কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না। আমরা তখন শরতের এই জ্যোৎস্না মাখা সমীরণে মাতাল ছিলাম। যদিও নাচছিলাম সেই গানের তালে , মাকে ভাসাইয়া জলে কী ধন লইয়া যাইমু ঘরে...।

৪

পুজোর ক’দিনে আর দশমীর পর এবাড়ি ওবাড়ি যেতে আসতে কিফ্রি শহরের অনেকটাই আমার জানা হয়ে গেছিল। চেনা হয়ে গেছিল যাদের চেনা যেতে পারত। যারা আমাদের পরিবারের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্কে বাঁধা। দিনে দুপুরে কখনো একা কখনো ভাই বোনদের নিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি যেতে আসতে কোনো বাধা ছিল না , তা যত দূরেই হোক। একেতো পথে গাড়িঘোড়া বিশেষ নেই, তার উপর পাহাড়ে এক আধটু শীত পড়লে যা হয় রোদের সস্নেহ ছোঁয়াতে গোটা দিন ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। লক্ষ্মী পুজোর দুপুরে মা আমাকে পাঠালেন ধরকাকুদের বাড়িতে। সম্ভবত পুজোর জন্যে দরকারি কিছু জিনিস দিয়ে আসতে এবং বিনিময়ে অন্য কিছু নিয়েও আসতে। কী, সেটি মনে নেই। লক্ষ্মীপুজো যদিও যার যার বাড়িতে হবে তবু যেমন তখন দেশের বাড়িতে হতো এখানেও হৈ হোল্লোড়ের কোনো খামতি দেখিনি। বরং যারা অবিবাহিত ছিলেন তাদের কারো বা কারো বাড়িতে ছিল বিশেষ নিমন্ত্রণ। যেমন রঞ্জিত কাকু। দিনে একবার এমনিতেই আসেন। লক্ষ্মীপুজোর সকালে দেখলাম তিনিই এসে এটি নিশ্চিত করে গেলেন যে আমাদের বাড়িতেই রাতে খিচুড়ি তৈরি হবে আর অর্ধেক কিফ্রি সেটি খেতে আসবে। কে কে আসবে, সে তালিকাও তিনি তৈরি করে গেলেন বাড়ি বাড়ি খবর দিতে। বিকেলে তিনিই এসে কোমরে গামছা বাঁধবেন, কথা রইল। এতে মানা করবার সাধ্যি কারো নেই, ইচ্ছেও নেই। কেননা তাতেই তো এই

ঘরে দুটো লোক জোটাবার বাহানা পাওয়া যাবে। আর সেবারে আমার উপস্থিতি ছিল এক বাড়তি বাহানা।

বাবা এখানে যে কোয়ার্টারে ছিলেন, সেটি ছিল দ্বিতল। এখানে স্টেট বেঙ্কের কর্মীরা বাবাকে নিয়ে তিনজনের পরিবার থাকতো। বাড়ির মালিক নাগা মানুষ। নাগাদের কোন শাখার মনে নেই, সুমি, সাংতাম কিম্বা ইয়েমচুঙের কোনো একটা হবেন। কেননা কিফ্রিতে ওদের উপস্থিতিই বেশি ছিল। যদিও অনেকেই তখন পাকা 'আসাম টাইপ' ঘরে বাস করছিলেন ওরা উঠোনের শেষ প্রান্তে নাগা কায়দায় তৈরি কাঠ-বাঁশের মাচার মতো ঘরে বাস করতেই ভালো বাসতেন । সেটি ওদের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ ছিল। বাইরে থেকে দেখলে বোঝবার উপায়ই ছিল না যে ওরাই বাড়ির মালিক। সামাতুরে আমাদের বাড়িতে নাগা মানুষের নিত্য আনাগোনা ছিল। বাবা সেখানে খণ্ড উন্নয়ন অফিসে (ভিডিও) প্রথমে কাজ করতেন। বোধহয় তাই। এখানে সেরকম বালাই নেই। যা কিছু কাজ তা অফিসেই হতো। বাড়িতে অকাজের ভ্রমণ না হলে কেউ বিশেষ আসত না । এই বাড়ির মালিক ভদ্রলোককেও কখনো আমাদের ঘরে এসে দু'দন্ড বসে আড্ডা দিয়ে যেতে দেখিনি। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। পুজো চলে গেলেই শুধু ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন মা ।

ওদিকে পাশের ঘরে তখন কেউ ছিলনা। গোটা উপর তলাটা জুড়ে থাকতেন বেঙ্কের ম্যানেজার। একা এক মারাঠি ভদ্রলোক । আর বাড়ি থাকলেই কীসব পুজো পাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তার, এক ভৃত্য ছিল বিহারি মুসলমান। সে একাই বাড়িটার তাপ বাড়িয়ে রাখত। নিচের তলাতে আমাদের দু'ঘরের রান্নাঘর ছিল পাশাপাশি । সুতরাং সেই ভৃত্যের সঙ্গে আমাদের দেখা দেখি হতো রান্নাঘরের দাওয়াতেই বেশি। লক্ষ্মীপুজোর দিন তারও মনিবের ঘরে ছুটি । সে যোগ দিল আমাদের ঘরেরই কিছু খুচরো কাজে । সে খুব জোরে রেডিও বাজাতো। সেই রেডিও শুনলেই মনে হতো, আমরা এখনো পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে পা দিইনি। তা নইলে, কাক পক্ষীর ডাক শুনবার জন্যেও কখনো হৃদয় কাঁদতে শুরু করত। শোনা যেত শুধু দূর পাহাড় থেকে ছুটে আসা বাতাসের ডাক।

মা আমাকে একাই পাঠালেন ধরকাকুদের বাড়ি। ওরা আমার পূর্ব পরিচিতও ছিলেন। একবার সামাতুর গেছিলেন ওরা স্বামী স্ত্রী । দু'রাত্তির থেকেছিলেন আমাদের বাড়ি ।তখন ওদের নতুন বিয়ে, এখন তিন সন্তানের মা-বাবা। বাবা কিফ্রি থেকে চলে আসবার অনেক দিন পরে অব্দি ওরা ওখানে ছিলেন। দীর্ঘদিন চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। লিখতেন মূলত কাকু, আমাদের মাকে। ওরা কলকাতার কাছে বাড়ি করছেন জানতাম, বড় ছেলেটিকে সেখানে কোথাও পড়তে পাঠিয়েছিলেন। তার পর আজ বহুদিন আর কোনো যোগাযোগ নেই।

একা পথ হাঁটতে একটু ভয় যে করছিল না তা নয়, কিন্তু সাবালক হবার এমন স্বীকৃতি উপভোগ করতে কারই বা ইচ্ছে না জাগে। একা একা উপরের পথে চড়তে শুরু করলাম। সারামাটি পাহাড়টা দেখতে দেখতে হিসেব করছিলাম ওখানে যেতে কোন পথে কতদূরই বা যেতে হবে। বোন সঙ্গে নেই, সুতরাং শাসন করবার কেউ ছিল না। আমি তারিয়ে তারিয়ে পথের প্রতিটি ছবি চেখে চেখে এগুচ্ছিলাম। তখন একটু আধটু মেয়ে দেখার অভ্যেসও গড়ে উঠছিল না বললে, ডাহা মিথ্যে বলা হবে। পথে যেতে যেতে লাল নীল চাদর গায়ে ওমন কিছু নাগা মেয়েরাও আমার দিকে এক আধটু দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবার করুণা করছিল । বুঝিবা, ভাবছিল এ কোন দেশের রাজকুমার !আমিও হাঁটছিলাম, যেন রাজত্বটা একটু দেখে নিতে এসছি। কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। কখনো হাঁটছি তো কখনো দাঁড়িয়ে আছি। কখনো সামনে তো কখনো পেছনে চোখ আমার ঘুরছে ফিরছে। কোন তাড়া নেই। ওবাড়িতে যাবার কীই বা আনন্দ, যতটা রয়েছে পথের পরে।

কিফ্রি সাগরপার থেকে প্রায় ২,৯৪০ ফুট উপরে। তার থেকেও প্রায় ৮,০০০ ফুট উপরে সারামাটি পর্বতমালা। সারামটির কাছে কিফ্রিকে দেখলে মনে হয় যেন মায়ের কোলে শিশু শুয়ে রয়েছে। শীতে সারামাটিতে বরফ জমে, কিন্তু আমার সে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। পরে একদিন এক বৃষ্টির ভোরে বোন তুলে দিয়েছিল ঘুম থেকে। ওর ধারণা ঠান্ডা যখন পড়েছে, পাহাড়ে তবে বরফ দেখা দেবে। প্রবল উত্তেজনায় , কেউ টেরটি পায়নি, আমরা দুই ভাইবোন নাগা-চাদর গায়ে ছাতা হাতে বেরিয়ে পথের উপর। এ বাড়ি ওবাড়ির মুরগিরাতো সেই মাঝ রাতেই জেগে হাঁক পাড়ে, আর যে পাখিরা ছিল তাদের তখন ঘুম ভেঙেছে মাত্র । আর সব্বাই ঘুমিয়ে আছে ।স্বয়ং পথও এতো ভোরে ওর বুকের উপর আমাদের এই উপদ্রব আশা করেনি। কিন্তু বোন বেচারি দাদাকে দেখাবার উল্লাসে এটি মোটেও ভাবে নি যে মেঘলা ভোরে সামনের পথটাও ওখানে স্পষ্ট চোখে পড়ে না, দূরের সারামাটিতো কল্পনারও বাইরে। তবে বৃথা যায়নি সে জাগরণ। আমরা দুটিতে সেই ঝিরেঝিরে বৃষ্টিতে এক ছাতার নিচে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম বাবাদের বেঞ্কে। মেঘলা ভোরে পূব আকাশে অল্প অল্প রোদের আভাসের রূপ কেমন তা বলে দেখানো আমার সাধ্যি নেই। তার মধ্যে যদি এমন হয় যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি লাল, হলদে,সাদা ডালিয়া ফুলের বাগিচায়। এক একটা গাছ সেখানে আমাদের দুটি কিশোর কিশোরীর মাথার থেকেও উঁচু । আশ মিটিয়ে দু'জনের হাতে যতটা ধরে ডালিয়া পেড়ে আমরা হাতে নিয়ে ফিরে এলাম, ঘর সাজাবো বলে। সারামাটি তখনো মেঘের চাদর গায়ে শুয়ে ছিল। এই সারামাটি পর্বতমালার কোনো এক ঝরণা থেকে নেমে গেছে নদী বরাক। সোজা দক্ষিণে গিয়ে মণিপুরে ঢুকে গেছে। মণিপুর থেকে কাছাড় হয়ে অসমে । করিমগঞ্জে গিয়ে সুরমা কুশিয়ারা হয়ে বাংলাদেশে দেশে ঢুকে সেই নদী মেঘনাতে গিয়ে মিশেছে। ঐ নদীর উপর মণিপুরের টিপাইমুখে বাঁধ হচ্ছে বলে এখন প্রতিবাদে ধরণিতল কাঁপিয়ে রেখেছে গোটা বাংলাদেশ । ওতো কথা তখন জানতাম না । আমরা এতো আত্মবিস্মৃত আর আত্মঘাতি মানুষ যে এখনো আমাদের পাঠ্য বইতে লেখে বরাক মনিপুর থেকে নেমে এসছে। ওদিকে আমরা ছেলে বেলা পড়েছি বরাক বুঝি নেমেছে পাটকাই পর্বতমালা থেকে। পাটকাই তিনসুকিয়ার একেবারেই কাছে অরুণাচল প্রদেশে এসে ছুঁয়েছে । সেই বা কী করে হয়! বছর খানিক আগে 'এবিওজিনেসিস' (Abiogenesis) নামে ডিমাপুরের একটি ব্যান্ড এই পাহাড়কে নিয়ে দুর্দান্ত গান বেঁধেছে 'সারামাটি টিয়ারস' । আমার সম্পাদিত পত্রিকা 'প্রজ্ঞানে' এ নিয়ে এক প্রতিবেদন তৈরি করবার বেলা ওদের সঙ্গে সারামাটির কথা আমি নিজেও এতো ভালো করে জানতে শুরু করি। যে সে ব্যান্ড নয়। পূর্বোত্তর ভারতের সঙ্গীতের ঐতিহ্য নিয়ে বাকি ভারতের এখনো কোনো ধারণাই নেই। বিশেষ করে পাহাড়ি রাজ্যগুলোর । অভিমানে ওরাও বাকি ভারতের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ গড়েন বলে মনে হয় না। অথচ সিঙ্গাপুর থেকে সিকাগো ওদের খ্যাতি রয়েছে। অরুণাচলের এক লামা তাসি গ্র্যামী পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হবার আগে কেই বা জানত, আর তার পরেই বা ক'জন তাঁকে মনে রেখেছে !

'এবিওজিনেসিসে'র দুটো এলবাম ইতিমধ্যে দু'দুবার , ৫১ এবং ৫২ সংখ্যক গ্র্যামী পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল। নিজেদের কিছু বাদ্য যন্ত্রও ওরা নিজেরা তৈরি করেছেন। তার মধ্যে একটি বাঁশে তৈরি বাঁশির মতো দেখতে। দলের প্রধান দুই সদস্য আর সদস্যা মোয়া এবং আরেনলা মিলে নাগা পরম্পরাগত বাঁশিতে সামান্য পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন 'হাওয়ে'। কিন্তু সেতো একালের কথা । সত্য হলো তখন সেই পাহাড়ের নামটা কিফ্রিতে তখনো কেউ বেশেষ জানত বলে মনে হয় না। তারা শুধু জানতেন ওই পাহাড়টাই সবচে উঁচু, ওতে বরফ জমে। ঐ সারামাটির কোলেই কি সামাতুর? আমি জানি না। কিন্তু 'সামাতুরে'র পর এই রহস্য ভরা 'সারামাটি'র পর্বত আমার স্মৃতিতে এতোটাই জায়গা করে নিল যে আজ এই আধা বুড়ো বয়সেও আমি কখনো এই আনন্দে ঘুম ছেড়ে জেগে উঠি যে সেই ভীষণ সুন্দর পাহাড়ে আমি চলে এসছি। পা ফেলে রীতিমতো এর কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছি । হয়তো আজ রাতেও ওদের দুটির সঙ্গে আমি আবার মুখোমুখি হ'ব। মুখোমুখি হতে চাই দিনে দুপুরে, কিন্তু

হতে পারি কৈ। যেতে পারি কৈ? আমার সঙ্গে যাদের নিতে ইচ্ছে হবে তাদের সব্বাই এখন পাহাড় চড়তে ভয়ে পায়। মাঝে মাঝে এও মনে হয়, গেলে কি আর কখনো আমার রাতগুলো অমন দারুণ সব সুন্দর স্বপ্নময় হয়ে থাকবে ? ধরকাকুদের বাড়ির পথে হঠাৎ দেখি বাঁদিকের এক ছোট্ট শাখা পথ থেকে (গলি বলা যাবে না) দু'ট বাচ্চা নাগা ছেলে ট্রাইসাইকেলে পথে নেমে এসছে। ওপথে ট্রাইসাইকেল চালাবার বিপদ জানি । একবার পনঞ্জু আমাকে এরকম তুলে ছেড়ে দিয়েছিল। শুরুতে যদিও বা ভালই লাগল গতি বেড়ে যেতেই আমিতো থামেতেই পারি না । ভাগ্যিস নিচের মোড়টাতে গিয়ে পথ খানিকটা সমতল আর চওড়া হয়ে গেছিল। ওখানে গিয়ে সাইকেল আপনি থেমে গেছিল। কিন্তু ওরা বেশ সেই ঢালি পথে সাইকেল চালাচ্ছিল, আর থেকে থেকে পা নামিয়ে সেটি বেশ দাঁড় করিয়ে নিজেদের পালা বদল করছিল। তাদের সেই খেলাতে আমার চোখ আটকে গেছিল বলে আমি দেখিনি উলটো দিক থেকে তখন তিনটি নাগা পুরুষ আমার দিকেই তাকাতে তাকাতে আমার সম্ভবত আমাকে নিয়েই কথা বলতে বলতে চড়াই উঠছিল। তার থেকে একজন এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ালো । শুরুতে আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওর মুখে নীরব হাসি দেখে সে ভয় চলে গেল, সে জায়গা নিল ক্রোধ। এ কেমন ঠাট্টা, আমাকে কি বাচ্চা ছেলে পেয়েছে ? ঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এক সময় ক্রোধের জায়গা নিল লজ্জা । সে লজ্জা আমার মুখেও হাসি আনতেই সে সঙ্গীদের নাগাতে কিছু বলল। কিন্তু আমাকে কিছু বলে না । আমি ডানে যেতে চাইলে সে ডানে পথ আটকায়, বায়ে যেতে চাইলে সে বায়ে। আমি বলতেও পারি না, যেতে দাও। ততদিনে আমি নাগামিজ ভাষা ভুলে গেছি। দু'দিনের অতিথি হয়ে ভুল ভাষা বলে লোক হাসিয়ে হবে টা কী, তাই আর নতুন করে শিখবার চেষ্টাও করি নি। এক সময় আমার কান্না পাবার জোগাড় হলো, এতো আচ্ছা মুস্কিল হলো দেখি। কে বা কারা ওদের উদ্দেশ্যটাই বা কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। ওভাবে কেউ কাউকে পথে আটকায় জানলেতো আর আমাকে একা আসতে দেয়াই হতো না। কী মনে করে যেন, ওরা একসময় নিজেদের মধ্যে হা হা করে হাসতে হাসতে আমার পথ ছেড়ে দিল। আমি দ্রুত পায়ে ধরকাকুদের বাড়ি চলে এলাম। ওদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা খুব সরল ছিল। আর ছিল মিশুকে। এই ক'দিনে আমি ওদেরও দাদা হয়ে গেছি। ওরা আমাকে বাড়ির বাইরেই পাকড়াও করে ভেতরে খবর দিল। ধরকাকু ওখানে এক সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবত তাই তাঁর সেদিন বন্ধ ছিল। কাকু জিজ্ঞেস করলেন, কী রে পনঞ্জু তোদের বাড়ি যায় নি? ওতো তোকে দেখতেই যাচ্ছে! "প...ন...ঞ্জু!" আমি যেভাবে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। আমি যাই। বলে পা বাড়াতেই, কাকিমা ভেতর থেকে এসে বললেন, "আরে, যাবি। ও কিফ্রিতে থাকবেতো। তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।" কে শোনে কার কথা! আমি যে কাজে মা পাঠিয়ে ছিলেন, সে কাজ চট জলদি সেরে জোরে পা চালালাম। এখনো আমাকে হাঁটতে হবে অ...নে...ক পথ! ডিঙোতে হবে অনেক চড়াই ।

কেন ও বলল না, ও পনঞ্জু! কেন শুধু কতকগুলো শুকনো ঠাট্টা করে চলে গেল? ওই কী? ও জানল কী করে আমি এসছি? যদি দেখাই করবে তবে আমাকে অমন আসতে দিল কেন? ওরতো কথা ছিল আমাকে কাঁধে তুলে নেবে! ছোঁ মেরে সেই পুরোনো দিনগুলোর মতো আবার হারিয়ে যাবে পাইন বনে! ছিল কী? পনঞ্জু কি এতো বুড়িয়ে গেছে? ও কি এতো মুটিয়ে গেছে? যে লোকটা আমার পথ আটকালো সেতো তেমনি ছিল দেখতে। ওর গায়ে ফুলহাতা কাজ করা কালো ডোরা কাটা সাদা সার্ট ছিল। পায়ে বুট জুতো। পনঞ্জুকে আমি দেখেছি সারাক্ষণ গায়ে একটা সাদা গেঞ্জি বা গেঞ্জি সার্ট পরে থাকতে। খাকি কিম্বা কালো পেন্ট । পায়ে চপ্পল কখনো থাকতো, কখনো না। শক্ত সমর্থ ছিল ,কিন্তু তেমন স্বাস্থ্য ছিল না।

সে ঐ খালি পায়ে , খালি গায়ে কিফ্রি চলে আসবে—অতোটা ভাবার মতো বুদ্ধু আমি ছিলাম না। কিন্তু মোটা হতে হবে আর চুলেও দু'একটা পাক

ধরাতে হবে ----এমন কোনো শর্ত থাকবারওতো কথা ছিল না। বাড়ি যেতে যেতে হাঁপিয়ে পড়েছি। কিছুটা ঘেমেও গেছি । কিন্তু এরই মধ্যে গোটা ঘর খুঁজে দেখি কোত্থাও কেউ নেই। মাকে জিজ্ঞস করলাম, 'কেউ এসছিল?' 'কে আসবে?' মায়ের পাল্টা প্রশ্ন, "এসছিস যদি তাড়াতাড়ি স্নান করে আয়।" আমার কি আর তখন স্নানে মন? মায়ের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারিনি , লজ্জায়। কী বলব? সত্যটা কী ? ও গেল কোথায়? আমার এই দৌড়ে আসাটাই যে বৃথা গেল।

তবু আসেই নি যখন, আমি স্নান সারতে গেলাম বাথরুমে । দু-এক মগ জল ঢালতেই শুনি উপরের সেই বাড়িতে নেমে আসার পথের থেকে ডাক, " ও বাবুনি! কী করি আছা?" আমার হাত থেমে গেল, হৃদকম্পন বেড়ে গেল। " কে এলো এই ব্যস্ত দিনে?" মায়ের গলায় বিরক্তি। তার পরের ডাক একেবারে ঘরের ভেতর, " তোমাখানর খবর লব আহিলোঁ।" ' ও! পনঙ্কু! আহা আহা।" আমি কি খুব দ্রুত হাত চালিয়ে ছিলাম? মনে পড়ে না। এমনিতে একচোট হেসে ফেলেছিলাম ঐ স্নানের ঘরে বসে। ও ওই পথের উপর ঠাট্টাটা করে আমাকে মুস্কিলেই ফেলে দিয়েছিল। আমার 'প্রেসটিজ' বলে কিছু রইল না । ও আফটার অল আমার মন্ত্রি ছিল। আমার নির্দেশ পালন ওর আজ ছিল। আজঅমন আচরণ করল যেন, আমি এক বাচ্চা ছেলে আর ও জ্যাঠা মশাই। এখন আমি ওর সামনে যাই কী করে?কথাই বা কী বলব? আমিতো আর ওর ভাষা বলতে পারি না। ও বললে কিছুটা বুঝব, কিন্তু জবাবে রা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এই সত্য আমি এ ক'দিনে কিফ্রি থেকে বুঝেছি । নাগা কারো সঙ্গে আমি একটিও কথা বলতে পারি নি । পুজোর সময়ও অনেকে গেছিল পুজো দেখতে । কারো সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েও দেয়া হয়েছিল। আমি শুধু মুখে এক চিলতে হাসি এনে মাথা নাড়িয়ে গেছি । এই ক'বছরে এতোটা দূরত্ব তৈরি হবে সে আমার কল্পনা করবারও দরকার পড়েনি কক্ষনো । দু'একটা শব্দ যে উচ্চারণ করতে পারব না তা নয়, কিন্তু যদি ভুল বলি-- সে লজ্জায় তাও বলিনি। বাড়ির পেছন থেকেও বসবার ঘরে ঢুকে তবেই বিছানা ঘরে যাওয়া যেত। আমি চুপচাপ এক কোন দিয়ে বিছানা ঘরে ঢুকবার সময় ও ওর স্বভাব সুলভ গলা উঁচু করে আওয়াজ দেয়, " হেইইই... কিমান টাইমতে আহিলে? " কোনো জবাব না দিয়ে আমি দৌড়ে ঘরে। এই কথার অর্থ দুটো হতে পারে, ভাবছিলাম। " কবে কিফ্রি এলে? ", " এখন যে কোথাও যাচ্ছিলে, কখন ফিরলে?" কী বিড়ম্বনা। এখন কোন উত্তর দিই? ছোট ভাইটি তখন পনঙ্কুকে ওর পুজোর নতুন খেলনা দেখাতে ব্যস্ত। বোন দৌড়ে এসে জানালো , "চিনিস? পনঙ্কুদা! সামাতুর থেকে এসছে!" জ্যাঠাইমা!আমি চিনব না তো ও চিনবে? আমরা যখন সামাতুর শাসন করতাম ও তখন বিছানাতে বসে দুধ খেত। জিজ্ঞেস করলাম, সঙ্গে দু'জন কে ? 'ওরা ওর এখানকার বন্ধু। ওর এখানে অনেকে আছে।" সঙ্গীরা সামাতুরের হলে কোনো কথা ছিল না। এখানকার বন্ধুতে আমার কী? পনঙ্কু তখন বলে যাচ্ছিল মাকে, "ছেলে বড় হয়ে গেছে! ... আগের বার যখন আসি বাবু বলছিলেন পুজোর পরে এবারে ওকে নিয়ে আসবেন। চলে এলাম। ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। দেখতে ইচ্ছেতো হয়ই।"

এমনটাও হয় তবে? ও শুধু আমার জন্যেই এসছে! জোরে চুলে চিরুনি চালাতে গিয়ে শুনি ও বলছে, এসছিল পাশের গাঁয়ে ওর আত্মীয় কারো খবর নিতে । ধরবাবুদের বাড়ির কাছ দিয়ে আসবার সময় উনি জানালেন, করবাবুর ছেলে এসছে। তাই চলে এলো। সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত উচ্ছ্বাস আমার চুল থেকে গড়িয়ে পড়া জলের সঙ্গে গলা বেয়ে কাঁধ দিয়ে নেমে গেল। নেহাতই কৌতুহল বশে আমি ধীর পায়ে ওর কাছে গেলাম। ও আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল। সসবই ঠিক ছিল। কিন্তু এ সেই পনঙ্কু নয়।

যতক্ষণ ছিল ও আমাকে ছাড়েনি। কত কি জিজ্ঞেস করল , আমি দু'একবার ঘাড় নাড়ানোর বেশি কথাই বলতে পারলাম না। ও একা আসত, আমাকে ডেকে কাছে কিম্বা দূরে নিয়ে যেত। আমি ওকে বলতাম আমি ওর

ভাষা ভুলে গেছি। ও নিশ্চয় আমাকে দু'একটা শিখিয়ে দিত। এখন এই এতোগুলো ওর পেয়ারের বন্ধুদের সামনে আমি বলি কী করে? আমি শুধু মাথা নেড়ে গেলাম, আর কথার জবাবে হাসবার অভিনয়টা করে ওর মান বাঁচালাম। কিন্তু ভেতরে এক তীব্র অপমান আমার সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে যাচ্ছিল। এতো এতো দিনের অপেক্ষার পর, সেদিনগুলো ফিরে আসতে আসতেও যে ওমন রঙ পালটে ফেলবে কে ভেবেছিল? আমার যে মা ওকে রীতিমত শাসন করতেন, ওর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে শাঁসিয়ে বলে দিতেন, "আর কোনো দিন ভর দুপুরে ওকে নিয়ে তুই ঐ পাব্লিক ফিল্ড পার করে যাবি তোর হাড় ভেঙে দেব!" সেই মায়ের হাতে করে দেয়া চা আর নারকেলের নাড়ু খেয়ে ও দিব্বি রসের আলাপ জুড়েছে। আর আমি ওর কোলে বসে আছি যেন বাচ্চা ছেলে! ও কি জানে না আর দু'বছর পর আমি কলেজে যাব? ও কি আমার কাকা? মামা? জ্যেঠামশাই? ঘন্টা খানিক পরে 'উঠি' বলে বন্ধুদের নিয়ে যে বেরিয়ে চলে গেল সে তাই ছিল। তাকে নাম ধরে ডাকতে আমার লজ্জা করছিল। এ কথা বলার অর্থ ছিল না কোনো, কোনো ভাবেই, " আবার কবে আসবে?" নীরবে বাড়ির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখলাম।

আমার বন্ধু পনঞ্জু তখনো একা একা সামাতুরের ঘন জঙ্গালের পথে কোনো এক ঝরণা তলার দিকে এগুচ্ছে। ওখানে ওর বান্ধবী কেউ স্নান করতে গেছে । ওর কাঁধে আমাদের ফেলে আসা বাড়িতে যে নতুন পরিবারটি এসছে তার বড় ছেলে। সে এখনো পাহাড়ে আছে । তার এখনো এই পাহাড় ছেড়ে নেমে যেতে অনেক দেরি...।

দেবীপক্ষে শুরু উল্কা-দান দিয়ে শেষ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে শ্রাবণের এক বৃষ্টিস্নাত সকালে মায়ের নাড়ি থেকে বিযুক্ত হয়েছিলাম আমি। তবে জন্ম ঘটনাচক্রে শিলিগুড়িতে হলেও আমার বড় হয়ে ওঠা কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরেই। সে কারণেই যতদিন গেছে জলপাইগুড়ি আমার রক্তের ভেতর চারিয়ে গেছে একটু একটু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেয়ে ফেলেছে আমার সত্ত্বাকে। ওস্তাদ তার কালোয়াতি গানে রাগের বিস্তার করতে করতে আবার সমে ফিরে আসেন, তেমনই যে কোন প্রসঙ্গের সুতো ধরে বলতে গিয়ে জলপাইগুড়ির কথা বলা আমার প্রিয় অবসেশন। শারদ উৎসবের স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে গেলে তাই জলপাইগুড়ির কথা বারবার এসে পড়বেই।

শারদ উৎসবের শুরু হয় মহালয়া দিয়ে। সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়। আর অমাবস্যা তিথিকে বলা হয় মহালয়া। আশ্বিনের এই অমাবস্যায় যথাবিহিত পারলৌকিক কর্মাদি সমাধা করে প্রতিপদ থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষের আয়োজন। এখন আলস্য মহাসাগরে ডুবে গিয়েছি। তাই মহালয়ার ভোরবেলা আর ওঠা হয়না। কিন্তু স্কুল কলেজে পড়ার সময় আমরা বন্ধুরা মিলে মহালয়ার ভোরে বেরতাম সদলবলে। বাজি পটকার দমাদ্দম শব্দ ছাপিয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে গমগম করে ভেসে আসত বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্রের মহিষাসুর-মর্দিনী। শারদ প্রাতে মেতে উঠত আমাদের নিজস্ব ভুবন। তখন দেখেছি প্রচুর মানুষ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন হাঁটুজলে। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে এসেছেন সবাই। শ্রাদ্ধ, তর্পণ এসবে অনেকে বিশ্বাস করেন না। অনেকে আবার গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। ভোরবেলা যারা এসেছেন তর্পণ করতে তাঁরা, স্থির বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন এখানে। নির্জন তিস্তা নদীর কূলে দাঁড়িয়ে তাঁরা হয়তো প্রশ্ন করেন চলে যাওয়া পিতৃপুরুষদের, আহ্বান করেন - তোমরা কোথায় চলে গেছ? সেই গত হয়ে যাওয়া পিতৃপুরুষেরা হয়তো ফিসফিস করে উত্তর দিয়ে যান - আছি, আছি। আমরা আছি তোমাদের নিবিড় স্মৃতিতে, আছি তোমাদের গহীন বেদনায়।

বিগ বাজেটের পূজা জলপাইগুড়িতে কিছু কিছু হয় বটে, থিম পূজার চলও শুরু হয়েছে আজকাল। ছোট থেকেই দেখে আসছি তরুনদল, পান্ডাপাড়া সার্বজনীন কিংবা কল্যাণী গ্রুপ বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচা করে পূজার আয়োজন করে প্রতিবার। চন্দননগরের আলো, কেষ্টনগরের ঠাকুর, মেদিনীপুরের মঞ্চসজ্জা – এমনই সব আকর্ষণ থাকে এসব পূজায়। কদমতলা সার্বজনীন আবার জাত কুলীন। বিরাট আটচালায় সেখানে প্রতিবার পূজিত হন টানা টানা চোখের ডাকের সাজের দুর্গা। ইদানীং মোহিতনগর আর পাতকাটা কলোনি মেগা পূজা করে এসে পড়েছে এই তালিকায়। পূজা মন্ডপে যত রাত বাড়ে তত ভিড় বাড়তে থাকে উৎসাহী ছেলে-বুড়োর। তবে আমার মনে হয় ঐতিহ্য আর পরম্পরার নিরিখে এই শহরের সেরা আকর্ষণ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আর বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পূজা।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শান্ত সমাহিত পরিবেশে মহাষষ্ঠীর দিন রামকৃষ্ণ দেবের সন্ধ্যারতির পর শুরু হয় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্থাপন করে পূজার সূচনা হয়। অষ্টমীর সকালে আশ্রমে কুমারী পূজা করা হয় ঘটা করে। তা দেখবার জন্য সারা শহর ছুটে আসে এখানে। যে শিশুটিকে কুমারী মনোনীত করা হয়, সে সেই বছর এই শহরের টক অফ দ্য টাউন। স্থানীয় কেবল টিভিতে লাইভ দেখান হয় সেই আচার অনুষ্ঠান। সেদিন আশ্রম চত্বর নব্য যুবক যুবতীদের ভিড়ে কাকভোর থাকে সরগরম। তাদের কলকাকলিতে কান পাতাই যেন দায়। অনভ্যস্ত রঙিন তাঁতের শাড়িতে আর জমকালো ধুতি পাঞ্জাবিতে সেদিন এখানে অলিখিত ভ্যালেনটাইন্স ডে। অষ্টমীর

সকালে কি যেন আছে, সেদিন ভ্রমর-কালো চোখের ইশারায় আর কাচপোকা টিপের মারণ উচাটনে বধ হয়ে যায় শয়ে শয়ে প্রেমিক তরুণ। নবমীর পূজা শেষে দেবীর হোম আর দশমীতে দর্পণে বিসর্জন শেষে রামকৃষ্ণ দেবের সন্ধ্যারতির পর প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় আশ্রমে।

বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পূজার আবার অন্য মজা। এবার এই পূজা পাঁচশো এক বছরে পা দিল। এখানে সোনা রুপোর অলংকারে সাজানো হয় মাকে। মহালয়ার রাতে রাজবাড়ির মন্দিরে কালীপূজা হয়। প্রতিপদে সেই কালীমন্দিরেই স্থাপন করা হয় দুর্গা পূজার ঘট। সেই দিনই মায়ের চোখ আঁকা সম্পূর্ণ হয়। একচালার প্রতিমায় মা দুর্গার সঙ্গেই থাকেন জয়া, বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর মহামায়া। সপ্তমীর সাতে হয় মায়ের বিশেষ পূজা। মাঝরাতে আটটি পায়রা বলি দেওয়া হয়। চালের গুঁড়ো দিয়ে পুতুল তৈরি করে বলি হয়। কথিত আছে আগে এখানে নরবলি হত। প্রাচীন কালের নরবলির অনুকরণে এই রীতি এখনো পালিত হয়। অষ্টমীর দিন পাঁঠাবলি, পায়রা বলি হয়। নবমীতে হাঁস, পায়রা, আখ, চাল, কুমড়ো, লেবু বলি দেওয়া হয়। দশমীর দিন সিঁদুর খেলা শেষে দিনের বেলাতেই রাজবাড়ির পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয় মায়ের প্রতিমা। রাজবাড়ির সদস্যরা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এই সময়ে ফিরে আসেন ঘরে। উৎসব মুখর হয় রাজবাড়ি, নতুন করে জ্বলে ওঠে ঝাড়-লন্ঠন। রাজপরিবারের পূজা হলেও সারা শহরের লোক উপচে পড়ে এখানে। সবার অংশগ্রহণে এই উৎসব সার্বজনীন রূপ নেয়।

প্রতি বছর সেই একই আয়োজন। দেখে দেখে মাথায় গেঁথে গেছে সব। তবুও তৃষ্ণা মেটে না। ফি বছর এই দুই জায়গায় ফিরে ফিরে আসেই। সপ্তমীর থেকে দশমীর সকাল-দুপুরগুলো কাটে এখানেই। চিরচেনা দৃশ্যগুলো জলছবির মত লুকিয়ে থাকে বুকের ভিতরে। পূজার সময় আবার ধুলো ঝেড়ে সেই ছবিগুলো ফিরে দেখি। যখন স্কুলে পড়তাম, তখনও আশ্রমের আর রাজবাড়ির পূজা দেখতে আসতাম বন্ধুদের সঙ্গে। এখন বেশির ভাগ বন্ধুই এখানে ওখানে ছিটকে গেছে কর্মসূত্রে। কিন্তু এ সময়ে তারা প্রায় সবাই ফিরে আসে নিজ শহরে। আবার রি-ইউনিয়ন হয় আমাদের। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের চাতাল কিংবা রাজবাড়ির আঙিনায় চাঁদোয়ার তলে বসে আমরা স্মৃতির ঘ্রাণ নিই। বিজয়া দশমীর সন্ধেবেলা বাবুঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলে এখনো শ্বাস ভারী হয়ে আসে। একটা আবছা কষ্ট হয় বুকের ভিতরে। গলার কাছটায় ডেলা পাকিয়ে ওঠে আজও।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা যম-লোক থেকে মর্ত্যলোকে নেমে আসেন মহালয়ার প্রত্যুষে। তাঁরা আবার যমলকে প্রস্থান করবেন ভূতচতুর্দশীতে। দীপান্বিতার রাতে। শাস্ত্রের বিধান – আমাদের মহালয়ার দিন পার্বণ শ্রাদ্ধ করা উচিত। কোনও কারণে না পারলে দীপান্বিতার দিন করতেই হবে। এর পর উল্কা-দান। ঠিক যেন কোনও চিত্রকল্প। অনুপম কবিতার মত। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ফিরে চলেন অনন্ত অন্ধকার পথে যমলকে। নভোচর উল্কা সেই পথ আলোকিত করছে। উল্কার আকৃতি কিছুটা মশালের মত। দীপান্বিতার রাত উল্কা-দানেরই প্রতীক। পুরাণকারের কি অসাধারণ কল্পনা। তারা নয়, উল্কার আলোয় পথ চিনে চিনে ফিরে চলেছেন ছায়া শরীরধারী সেই তাঁরা, যারা একসময় এই পৃথিবীর হাসি কান্নার শরিক ছিলেন।

সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে যে উৎসবের সূচনা, তার সমাপ্তি ঘটে এই সময়টাতেই। আমাদের হৃদয়ের তাপে স্পন্দিত এই বর্ণিল শারদ উৎসব এমন কাব্যিক পরিসমাপ্তিই বোধহয় দাবী করে।

ছেলেবেলার উৎসবের স্মৃতি

কফিহাউসের আড্ডা ই-বুক সঙ্কলন

coffeehouseradda.in

বৈশাখ – ১৪১৮

কলকাতা